বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 551. July, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫১ সংখ্যা। { আষাঢ়, ১৩১৬। জুন, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বঙ্গে শিল্পোন্নতি—সম্প্রতি বঙ্গদেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি লোকের যেরূপ অনুরাগ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা করা যায়, নিত্যব্যবহার্য্য বা সুখসেব্য দ্রব্যাদির জন্য বঙ্গবাসীকে আর অধিক দিন পরপ্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইবে না।

বস্ত্র—অল্প দিন হইল শ্রীরামপুরে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল এবং কুষ্টিয়ার মোহিনী মিল নামক দুইটী বস্ত্রের কল স্থাপিত হইয়াছে। আবার শুনা যাইতেছে, লিলুয়ার নিকটে গণেশ মিল, ওরিয়েণ্টাল কটন মিল. কল্যাণ কটন মিল প্রভৃতি আরও কয়টী কাপড়ের কল শীঘ্রই স্থাপিত হইবে। এতদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্রই তন্তুবায়-সমিতির তাঁতের ব্যবসায়েরও দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে। ফরাসডাঙ্গা, শান্তিপুর. পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের তাঁতের কাপড় চিরপ্রসিদ্ধ; অধুনা এই সকল স্থানের কাপড়ের উৎকৃষ্টতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে।

লৌহ ও ষ্টীলের জিনিস—বঙ্গদেশের অনেক স্থানে উৎকৃষ্ট লোহার সিন্দুক প্রস্তুত হইতেছে। কলিকাতা চিৎপুর রোডের দাস কোম্পানীর প্রস্তুত এবং কুষ্টিয়ার লোহালী নামক স্থানে প্রস্তুত লৌহের সিন্দুক প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।

কাঁটা ও নিক্তি—কলিকাতা ৬১ নং নারিকেলডাঙ্গা রোড, চড়কডাঙ্গায় চারুচন্দ্র কর্ম্মকারের কারখানায় প্রস্তুত ওজনের কাঁটা ও নিক্তি অতি সুন্দর ও সুলভ।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে, বর্দ্ধমানে, কাঞ্চননগরে. সাহাবাজে. জগদীশপুরে এবং বীরভূম, চব্বিশপরগণা, যশোর, খুলনা প্রভৃতি স্থানে ছুরি, কাঁচি ক্ষুর ও অন্যান্য অস্ত্র অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতেছে।

ষ্টীলট্রাঙ্ক ও ক্যাস বাক্স—কলিকাতা আর্য্যফ্যাক্টরীতে অতি সুন্দর ও সুদৃঢ় ষ্টীল

বাক্স প্রস্তুত হইতেছে। মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে চারিটী কারখানাতেও উৎকৃষ্ট ষ্টীল ট্রাঙ্ক প্রস্তুত হইতেছে।

নূতন ধরণের গহনা—সম্প্রতি বঙ্গদেশের সুদক্ষ স্বর্ণকারগণ আপনাদিগের ব্যবসায়ে বিলক্ষণ নৈপুণ্য দেখাইতেছেন। কলিকাতা রাধাবাজারের বিনোদবিহারী দত্তের দোকানে দেশীয় কারিকরের দ্বারা প্রস্তুত মিনেকরা সোণার গহনা দেখিলে দেশীয় শিল্পোন্নতির সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। সোণার গহনার উপরে মিনে অর্থাৎ এনামেলের কাজ করায় গহনাগুলি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। গহনার উপরে এরূপ কারুকার্য্য পূর্ব্বে কখনো এদেশে দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এরূপ গহনা ইতিপূর্ব্বে বিদেশ হইতেই আমদানি হইত, তাহাতে দেশের বিপুল অর্থ বিদেশীয়ের হস্তে গিয়া পড়িত। এখন দেশের অর্থ দেশেই থাকিবে, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে!

পিতল, কাঁসা ও তামার জিনিস—হুগলি, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, গয়া, পাটনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে বিভিন্ন ধাতুর নানা প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের খাগড়াই বাসন সুপ্রসিদ্ধ। হুগলিতে টেলেস্‌কোপ্ প্রস্তুত হইতেছে।

তালা চাবি—কলিকাতা, টালায় দাস কোম্পানীর কারখানায় এবং নাটাগড়ে অত্যুৎকৃষ্ট তালা চাবি প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে চব্বের তালার পরিবর্ত্তে এই তালা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর এবং সহজে খোলা যায় না।

সাবান—বঙ্গের নানাস্থানে সাবান প্রস্তুত হইতেছে। তন্মধ্যে বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরী, ন্যাশেনাল সোপ ফ্যাক্টরী, বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরীর সাবান গুণে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে।

পর্সিলেন—পূর্ব্বে চিন জাপান প্রভৃতি স্থান হইতেই পর্সিলেনের বাসন, পুতুল প্রভৃতি আমদানি হইত। আমাদের দেশে কেহ উহা প্রস্তুত করিতে জানিত না। কিছু দিন হইল, শ্রীযুক্ত সত্য সুন্দর দেব জাপানে কিছুকাল অবস্থান করতঃ পর্সিলেনের বাসন, পুতুল প্রভৃতির গঠনকার্য্য শিক্ষা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এবং কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের সাহায্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ট্যাঙ্গরা নামক স্থানে কলিকাতা পাটারী ওয়ার্কস (Calcutta Pottery Works) নামক একটী কারখানা স্থাপন করতঃ দক্ষতার সহিত কাজ করিতেছেন। ইনি জাপান হইতে দুইটী সুদক্ষ জাপানী কারিকর সমভিব্যাহারে আনিয়া উহাদের এক জনকে ২১০৲ এবং অন্য জনকে ১৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে পটারীর কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। মিষ্টার এস্ দেব নিজে এবং এই দুইটী জাপানী কর্ম্মচারী দ্বারা দেশীয় লোকদিগকে পর্সিলেন প্রস্তুত করিবার প্রণালী দক্ষতার সহিত শিক্ষা দিতেছেন। ইহাঁর

যত্নে ও চেষ্টায় পর্সিলেনের কাজ বঙ্গে স্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ভবিষ্যতে এদেশে পর্সিলেনের বাসন আদি প্রস্তুত করিবার লোকের অভাব থাকিবে না, তাঁহার বর্ত্তমান কার্য্যকুশলতা দর্শনে এরূপ আশা করিতে পারা যায়। এই কারখানায় প্রস্তুত পর্সিলেন ও বিদেশীয় পর্সিলেনের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য না থাকায় অনেকে পর্সিলেনের জিনিস ক্রয়কালে ভ্রমে বিদেশীয় জিনিস ক্রয় করিতে পারেন, অতএব এই কারখানায় প্রস্তুত সমস্ত জিনিসের উপর কারখানার নাম অঙ্কিত থাকা একান্ত কর্ত্তব্য।

নিবেদন।

প্রাণপ্রতিম স্বদেশবাসিগণ! মাতৃভূমির কল্যাণসাধনের ন্যায় মহত্তর পুণ্যকার্য্য আর কি আছে? মাতৃপূজার ন্যায় মহাপূজা আর কি আছে? এ মহাপূজার উপকরণ কিরূপ পবিত্র হওয়া উচিত, তাহা বলিয়া জানান যায় না। এ মহাপূজায় রাগ, দ্বেষ, রোষ, অভিমান, প্রতিহিংসা প্রভৃতি দূষিত ভাবের রেখামাত্র পতিত হইলেই সমস্ত সাধনা ব্যর্থ হইবে, দুর্গতি আরো ঘনীভূত হইবে। সেই সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের চক্ষু, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অণু পরমাণু, সর্ব্বত্রই অহোরাত্র সমভাবে জ্বলিতেছে। আত্মগোপন—কপটতা তাঁহার নিকট খাটে না। বিশুদ্ধ ভক্তহৃদয়ই তাঁহার পূজার পুষ্পপাত্র। বিশুদ্ধ ভক্তহৃদয়ের সাধু সংকল্পই তিনি গ্রহণ ও পূরণ করেন। কার্য্যসিদ্ধিলাভে হতাশ হইয়া, আমরা অনেক সময় ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের নিন্দা করিয়া থাকি। কিন্তু আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখি না, আমরা ঈশ্বরকৃপার কতদূর যোগ্যপাত্র হইয়াছি। বিষম দশায় পতিত হইয়া দৈব বা ঈশ্বরকে নিন্দা করা নিতান্ত কাপুরুষের কার্য্য। দৈব, ফলোন্মুখ কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়। তুমি বিশুদ্ধ হৃদয়পীঠে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে স্বদেশের মঙ্গলকার্য্যে প্রবৃত্ত হও, সময়ে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে। অধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য অচিরে ধূলিসাৎ হয়; কিন্তু ধর্ম্মের ঐশ্বর্য্য অক্ষয় ও অবিকারী, কল্পান্তেও উহার জ্যোতিঃ ম্লান হয় না।

স্বদেশের জন্য যাহা কিছু সদনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা প্রশান্তচিত্তে এবং সৌম্যভাবে করাই কর্ত্তব্য। রাগ, দ্বেষ বা রাজদ্রোহবুদ্ধি প্রভৃতি মলিন ভাব অন্তরে প্রবেশ করিলে, হিতে বিপরীত ঘটে। ইহার দৃষ্টান্ত আজি সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। বিশুদ্ধ ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, সদ্ভাবের সহিত, বিনা আড়ম্বরে, শনৈঃ শনৈঃ কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হওয়াই সিদ্ধিলাভের উপায়।

জাতীয় একতাই মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম;

এই একতাই সমাজকে পতন হইতে রক্ষা করে। জাতি-বর্ণ-ধর্ম্মগত একতাই স্বদেশের সর্ব্বপ্রধান রক্ষাকবচ। অন্যান্য অশেষ মহাপাপ করিয়াও, কেবল এই একতার প্রভাবেই অনেকে আত্মরক্ষা করিতেছেন। এই জাতীয় একতার মূলমন্ত্র-সমধর্ম্মিতা। যে দিন বুঝিব, আমরা এক পিতা মাতার সন্তান, বিশ্বম্ভরা আমাদের সাধারণ জননী, সেই স্বরাট্ বিশ্বনাথ আমাদের সাধারণ পিতা; যে দিন বুঝিব, আমি সকলেরই, এবং সকলেই আমার; যে দিন বুঝিব, পরদুঃখ ও পরসুখের নাম—আত্মদুঃখ ও আত্মসুখ; জলাশয়ের এক প্রান্তে আঘাত করিলে, তদবচ্ছিন্ন বীচিপরম্পরায় যেমন সমস্ত জলাশয় আলোড়িত হয়, তেমনি যে দিন একের দুঃখে, একের আঘাতে সমভাবে সকলেই বিক্ষুব্ধ হইবে; যে দিন আমাদের ভুক্তি ও মুক্তি, এই বিশ্বপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত হইবে, সেই দিন আমরা মনুষ্য-নামের অধিকারী হইব।

হে আর্য্যসন্তানগণ! তোমাদের সেই ভুবনপাবন পিতৃকুলকে স্মরণ কর! সেই জ্ঞানকল্পতরু জগদ্‌গুরু ভারতীয় আচার্য্য-গণকে স্মরণ কর! তাঁহাদের প্রভাবে এ দেশ একদা অমরগণেরও লোভনীয় হইয়াছিল। কথিত আছে, সুরগণও স্বর্গ ছাড়িয়া এই ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতে আসিয়া বাস করিতে কামনা করিতেন; কেননা, এই আর্য্যভূমি সাধনার ও সিদ্ধিলাভের অদ্বিতীয় ক্ষেত্র। মহাভারতে লিখিত আছে,—

"সুদুর্লভতরং প্রাপ্য মানুষ্যমপি যো নরঃ।
ধর্ম্মাবমন্তা কামাত্মা ভবেৎ স খলু বঞ্চিতঃ॥
ইহৈব নরকব্যাধিচিকিৎসাং ন করোতি যঃ।
গত্বা নিরৌষধং স্থানং স রুজঃ কিং করিষ্যতি॥"

—এই কর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষই পুণ্যসঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ স্থান। জীবগণ সহস্র জন্ম বহু পুণ্য সঞ্চয় করিয়া, সেই পুণ্যফলে ভারতে নরজন্ম লাভ করে। এই ভারতে নরজন্ম লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি ধর্ম্মের অব-মাননাপূর্ব্বক কামভোগে আসক্ত হয়, তাহার ন্যায় হতভাগা কে আছে? ভারতের ন্যায় সর্ব্বরোগের (কামাদি আভ্যন্তর ব্যাধির) চিকিৎসালয় আর কুত্রাপি নাই। এমন স্থানে বাস করিয়াও, যে অভাগা নিজ নরকব্যাধির চিকিৎসা না করে, সে জন্মান্তরে এমন কোনও জঘন্য স্থানে পতিত হয় যে, আর তাহার নিস্তারের উপায় থাকে না।

ভারতের ঈদৃশ মাহাত্ম্য শুধু ইহার ব্রহ্ম-বলের প্রভাবে, ভারতের মণি-কাঞ্চনের প্রভাবে নহে। মণি কাঞ্চনের চাকচিক্যে বণিক্‌জাতিই আকৃষ্ট হয়। উহাতে আর্য্য-সন্তানের আকৃষ্ট হওয়া উচিত নহে। হে আর্য্যসন্তান! যদি স্বদেশের দুঃখ-মোচনের জন্য যথার্থই প্রাণ কাঁদিয়া থাকে, এ আর্য্যভূমির প্রলুপ্ত গৌরবকে উদ্ধার করিবার জন্য যদি তোমাদের অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া থাকে, তবে যোগীর ন্যায় কঠোর সংযম ধারণ পূর্ব্বক, একান্তভাবে ব্রহ্মবলের সাধনা কর। যে সাধনার বলে ভগীরথ মর্ত্ত্যলোকে পতিতপাবনীকে

আনয়ন করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয় বল দ্বারা অভীষ্টলাভে হতাশ হইয়া, মহাতপা বিশ্বামিত্র যে সাধনার বলে অক্ষয়া ও অপরাজেয়া ব্রহ্মশক্তি লাভ করিয়াছিলেন, যে সাধনায় সিদ্ধকাম হইয়া, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট, মহম্মদ প্রভৃতি সাধকগণ অসংখ্য মানবহৃদয়ে শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গিয়াছেন; আজি সকলে অনন্যপরায়ণ হইয়া একান্ত ভাবে সেই ব্রহ্মবলের সাধনায় নিযুক্ত হও। ব্রহ্মবলকেই নিজ নিজ শর্ম্ম-বর্ম্ম-ধর্ম্ম-কর্ম্ম ও গতি-মুক্তি-রূপে আশ্রয় করিয়া, অদম্য তেজে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হও। এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে ত্রিলোকীর প্রভুত্ব তোমাদের করতলস্থ হইবে।

"শীলেন হি ত্রয়ো লোকাঃ শক্যা জেতুং
ন সংশয়ঃ।
নহি কিঞ্চিদসাধ্যং হি ভবে শীলবতাং
ভবেৎ॥"
(মহাভারত)

—একমাত্র চরিত্রবলেই ত্রিভুবন জয় করা যায়। যিনি চরিত্রবলে বলীয়ান্, এ সংসারে তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই।

হে সর্ব্বশক্তিমন্! করুণাময়! জগদীশ! তুমি আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগ্রত থাকিয়া, আমাদিগকে শাশ্বত ধর্ম্মপথে চালিত কর! হে প্রাণেশ্বর! প্রাণময়! পরমাত্মন্! তুমিই আমাদের প্রাণনাড়ীর মূলগ্রন্থি, আমাদের জীবনপথের নেতা, তুমিই আমাদের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল, তুমিই আমাদের মূলধন ও লাভ। হে মঙ্গলময়! তোমাকে ছাড়িলেই আমরা সমূলে বিনষ্ট হইব, ইহকাল, পরকাল হারাইব। জননী যেমন রোগার্ত্ত শিশুকে ত্যাগ করে না, ঘোর কৃতঘ্ন সন্তানকেও স্নেহনির্ভরে বক্ষে ধারণ করে, তেমনি তুমি আমাদের সকল পাপ, সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া, আমাদিগকে কর্ত্তব্যপথে চালিত কর, আমাদের পাপবুদ্ধিকে উন্মূলিত কর! আমরা কর্ম্মদোষে অধঃপাতের চরম সীমায় পতিত, জগতের সমস্ত উন্নত জাতির নিকট আমরা কাপুরুষের অগ্রগণ্য ও অতীব ঘৃণার পাত্র। অন্নপূর্ণার সন্তান হইয়া, আমরা পরদ্বারে মুষ্টিভিক্ষার জন্য লালায়িত! ভারতীয় আর্য্যসন্তানের ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অধঃপতন আর কি আছে?

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তুলসীর ভগবৎসঙ্গীতের প্রভাববিষয়ে বহুতর আশ্চর্য্য ঘটনার কিংবদন্তী আছে। সে সকল ঘটনা অনেকে বিশ্বাস না করিতে পারেন। কিন্তু অলৌকিক সাধুজীবনের অলৌকিক কার্য্যকলাপে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কুতূহল

চরিতার্থ করিবার জন্য সে সকলের উল্লেখ করা কর্ত্তব্য।

তুলসীদাস একদা নৈমিষারণ্য হইতে কাশীধামে আগমনকালে পথিমধ্যে ভীষণ দস্যুদল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তৎকালে ঐ সকল পথ বহুতর হিংস্র জন্তু ও দস্যুগণের উপদ্রবে এক প্রকার অগম্য ছিল। তাঁহার ভ্রমণকালে একদিন পথে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সম্মুখে ঘোর অরণ্যানী, দিবালোক ভিন্ন সে অরণ্যে গন্তব্য পথ নির্ণয় করা অসাধ্য। সে রাত্রি অগত্যা সেই অরণ্যেই বাস করিতে হইবে, অন্য আশ্রয় নাই। তিনি একাকী একটী প্রকাণ্ড অশ্বথমূলে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতে লাগিলেন। এমন সময় তথায় একদল তীর্থযাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা নৈমিষাদি তীর্থ দর্শন করিয়া গৃহে ফিরিতেছে। তাহারা বহুসংখ্যক; তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। তথায় দিব্যমূর্ত্তি তুলসীকে দেখিয়া তাহারা যেন মৃতদেহে প্রাণ পাইল। সকলে সসম্ভ্রমে গিয়া তুলসীর চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল। তিনি সকলের মুখে বিষম ভীতিচিহ্ন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদিগকে এরূপ ভীত ও বিষণ্ণ দেখিতেছি কেন? তাহারা ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে কহিল,—ঠাকুর! আমরা কোনও পথিকের মুখে শুনিলাম, এ বনমার্গ ভীষণ দস্যুদলের আবাসস্থান। রাত্রি উপস্থিত; এক্ষণে আশ্রয়লাভের স্থান নির্ণয় করা অসাধ্য। অগত্যা এই সঙ্কটাকীর্ণ অরণ্যেই আমাদিগকে রাত্রিবাস করিতে হইবে। আমাদের সঙ্গে অর্থ ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রহিয়াছে। আমরা আজি ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম। মহাভয়ে আকুল হইয়া আপনার চরণে শরণাপন্ন হইয়াছি। আকার দেখিয়া আপনাকে কোনও দেবতা বা মহাপুরুষ বলিয়া জ্ঞান হইতেছে। কৃপা করিয়া আজি এ সঙ্কটে আপনি এ অসহায়দিগকে রক্ষা করুন। আমাদের আর গত্যন্তর নাই। ইহা বলিয়া তাহারা কাতর স্বরে রোদন করিতে লাগিল।

তুলসী তাহাদিগকে অভয়দান করিয়া কহিলেন, ভয় নাই, তোমরা আমার সম্মুখে উপবেশন কর। একান্তভাবে সেই বিপত্তিহারী, করুণাসিন্ধু ভগবানকে স্মরণ কর। দয়াময়, ভক্তবৎসল অবশ্যই রক্ষা করিবেন। কোনও ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে, বিন্দুমাত্র ব্যাকুল হইও না, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিও না; আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া মনে মনে সেই দীনবন্ধুর নাম জপ কর। তাঁহাতে একান্ত বিশ্বাস স্থাপন করিলেই সকলে সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইবে। দেখিও, ইহার অন্যথা না হয়।

তাঁহার ঐ কথা শুনিয়া সকলে নিঃশব্দে তাঁহাকে ঘেরিয়া মণ্ডলাকারে উপবেশন করিল। তুলসীর নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ উষায় ও সন্ধ্যায় ভজনসঙ্গীত গান করিতেন। তিনি সায়ংকাল উপস্থিত দেখিয়া সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন। সে দিন সে সঙ্গীত শীঘ্র ভঙ্গ করিলেন না। সন্ধ্যায়

কিয়ংক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হইল। সুধাংশুর রশ্মিজাল বনতরুরাজির ঘনকৃষ্ণ পল্লবরাশির রন্ধ্র দিয়া ভূতলে পতিত হওয়ায়, ও মন্দ মন্দ পবনহিল্লোলে কম্পিত হওয়ায়, সেইস্থানে আলোক ও ছায়ার বিচিত্র লহরীলীলা প্রকটিত হইল। সে স্থানে যেন অপূর্ব্ব চিন্ময় গন্ধর্ব্বনগরের (১) প্রতিবিম্ব ক্রীড়া করিতে লাগিল। তুলসী বৃক্ষমূলে যোগাসনে উপবিষ্ট, নয়নযুগল অর্দ্ধনিমীলিত, দেহ স্পন্দশূন্য। তাঁহার ভজনসঙ্গীতের শিবশক্তিময়ী রাগধারা তদীয় হৃদয়ের অনাহত চক্র ভেদ করিয়া সেই প্রেমসিন্ধুর অভিমুখে ছুটিয়াছে। চরাচর নিস্তব্ধ। যাত্রিগণ ভাবাবেশে সংজ্ঞাশূন্য।

হঠাৎ সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া লোমহর্ষণ বিকটধ্বনি উত্থিত হইল, সমস্ত বনভূমি কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই তথায় ভীষণাকার, সশস্ত্র দস্যুদল দৃষ্ট হইল। তাহাদের পুরোভাগে অশ্বপৃষ্ঠে এক মহাকায় বীরপুরুষ; তিনিই সেই দস্যুদলের নেতা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে তাঁহার দৃষ্টি তুলসীর উপর পতিত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল, তরুমূলে কোনও দেবতা বসিয়া গান করিতেছেন, এই জনমণ্ডলী অবাক্ হইয়া শুনিতেছে। অথবা ইহারাও বুঝি দেবমূর্ত্তি. নহিলে স্পন্দহীন কেন? দস্যুগণের যে ভীষণ নাদে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়, বীরগণেরও সংজ্ঞা বিলুপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ করিয়াও, ইহারা ত বিচলিত হইল না! কাহারও ত কোনও ভয়চিহ্ন দেখিতেছি না। এ কি? আমার অশ্ব বারংবার কশাঘাতেও আর একপদও অগ্রসর হইতেছে না! গমনার্থ সম্মুখের পদদ্বয় তুলিয়া, সেই ভাবেই রহিল! দস্যুপতি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় সমস্ত বনভূমি কাঁপাইয়া দস্যুদল হইতে পুনরায় বিকট চিৎকারধ্বনি উত্থিত হইল। দস্যুপতি তৎক্ষণাৎ সঙ্কেতসূচক বংশীধ্বনি করিলেন; দস্যুদল অমনি নিঃশব্দে পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান রহিল। তখন তুলসীর কণ্ঠ হইতে সঙ্গীতপীযূষধারা লহরে লহরে ছুটিতে লাগিল. জল, স্থল, আকাশ ছাইয়া ফেলিল। তখন কে দস্যু? কে তুলসী? কে যাত্রী? কিছুই নির্ণয় হয় না। সকলি একাকার; সাধু, দস্যু, স্ত্রী, পুরুষ, মনুষ্য, পশু, চেতন, অচেতন সকলি একটী আনন্দময়, প্রেমময় পবিত্র প্রবাহে পরিণত! (ক্রমশঃ)

(১) অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের আতাম্র কিরণমালা সান্ধ্য মেঘস্তবকে প্রতিফলিত হইয়া যে অপূর্ব্ব চিত্রময় দৃশ্যকে প্রকাশিত করে, তাহাকে গন্ধর্ব্বনগর বলে।

মহাভারতের কথা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পিতা বলিলেন,—বৎস! দেখিতেছি. রূপে ও শীলে তুমি এ বংশের যোগ্য সন্তান। আমি তোমাকে নানারূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে, তোমার শক্

গ্রহণ করিব। তুমি ইহা বিশুদ্ধ ভক্তি-ভাবেই দিতেছ। ইহা বলিয়া, তিনি প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সেই শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সে অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। অতিথিকে অতৃপ্ত জানিয়া ব্রাহ্মণ বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন, এবং নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্নেহপ্রতিমা পুত্রবধূ নিজের শক্তুগুলি লইয়া প্রফুল্লমুখে শ্বশুরকে কহিলেন,—পিতঃ! আপনারা কুশলে থাকিলেই আমার সকল দিক্ রক্ষা পাইবে। আপনাদের কৃপায় আমার অক্ষয় স্বরলোকে গতি হইবে। আপনাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। অতএব কৃপা করিয়া আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন।

উপবাসমুমূর্ষু পুত্রবধূর কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ সাশ্রুলোচনে বলিলেন,—সতি! লক্ষ্মি! মা আমার! নিরন্তর বাত, বর্ষ ও আতপাদি সহ্য করিয়া, তোমার দেহ বিবর্ণ ও বিশীর্ণ, তদুপরি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদিসাধনায় ও কঠোর উপবাসক্লেশে তুমি মা! অস্থিসার হইয়াছ। তোমাতে আর জীবিতের আকার নাই। তোমার দিকে চাহিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমি ধর্ম্মঘাতী হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কিরূপে তোমার আহার গ্রহণ করি? হে কল্যাণি! তুমি এমন কথা বলিও না। আমার সমক্ষে তুমি মা! অনাহারে মরিবে, আমি দেখিব? তুমি বালিকা ও ক্ষুধার্ত্তা, কঠোর পরিশ্রমে ও দীর্ঘকাল উপবাসে তোমার প্রাণবিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। আমার প্রাণ দিয়াও তোমার প্রাণ রক্ষা করা উচিত। তুমি যে মা! আমাদের আনন্দময়ী-কুললক্ষ্মী।

পুত্রবধূ কহিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা (১), আমার দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সকলি আপনাদের সেবার জন্য। হে দেব! আপনাদের প্রসাদে আমার শুভলোকে গতি হইবে। হে পিতঃ! আপনাদের চরণে আমার দৃঢ়ভক্তি জানিয়া, আমাকে আপনাদের নিতান্ত আপনার জানিয়া, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। শ্বশুর কহিলেন,—অয়ি বৎসে! তোমার এ শীল-সৌন্দর্য্য কি মধুর! ধর্ম্মব্রতে তোমার কি অচলা ভক্তি! অতুলনীয় তোমার গুরুভক্তি! তুমি ধার্ম্মিক রমণীর শিরোমণি। তোমার একান্ত ভক্তি ও আগ্রহ জানিয়া আমি তোমার মনোরথ ভগ্ন করিব না। ইহা বলিয়া তিনি বধূর হস্ত হইতে শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। তখন অতিথি সেই সাধুবরের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি প্রীতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্ম, নররূপে তোমাদের ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমরা জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তাহাতে আমি

(১) 'গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা'—আমার পরম গুরু পতির আপনি গুরু, এবং আমার আরাধ্য দেবতা পতির আপনি আরাধ্য দেবতা।

নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। ঐ দেখ! স্বর্গ হইতে তোমাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতেছে। অমরধামে তোমাদের এ পুণ্য বিঘোষিত হইতেছে। দেবতারা ও দেবর্ষিগণ তোমাদের দর্শন কামনা করিতেছেন। পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ তুমি নিত্যানন্দধামে গমন কর। ব্রহ্মচর্য্যে, তপস্যায়, যজ্ঞে, দানে ও অকপট ধর্ম্মশীলতায় তোমরা স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা এমনি ভয়ানক বস্তু যে, ইহাতে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও বিবেক, সকলি বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাভিভূত ব্যক্তির প্রাণবায়ু দুঃসহ যাতনায় বহির্গত হয়। এই দুঃসহদুঃখদায়িনী, প্রাণহারিণী ক্ষুধাকে ধর্ম্মানুরোধে যে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ সাধু কে আছে? দেখ! তুমি আপনার ও প্রাণাধিক পুত্র, কলত্র প্রভৃতিরও প্রাণের মায়া না করিয়া, ধর্ম্মকেই সার বস্তু জ্ঞান করিয়াছ। শ্রদ্ধাপূত, নিঃস্বার্থ দান অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম কি আছে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি স্বর্গপথের কণ্টকস্বরূপ। যাহারা ঐ সকল রিপুকে জয় করিয়া, যতদূর শক্তি, দান করে, সনাতন স্বর্গলোকের তাহারাই অধিকারী। তুমি একটী কপর্দ্দক দান কর, বা কোটি স্বর্ণ দান কর, তুমি দিব্য মিষ্টান্ন দান কর, বা তণ্ডুলকণা দান কর, তুমি সুধাভাণ্ড দান কর, বা জলবিন্দু দান কর, যদি সে দান তোমার যতদূর শক্তি, তদনুরূপ হয়, যদি সে দান তোমার হৃদয়ের সুপবিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত হয়, তবে সে সকলি তুল্যমূল্য। তোমাদের এ শক্তুদানের নিকট কোটি কোটি অশ্বমেধ ও রাজসূয় পরাভূত। অতএব তোমরা শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়া সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ কর।

উঞ্ছবৃত্তি-কথার পরিশিষ্ট।

মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তি-পরিবারের কথা আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌম পদে অভিষিক্ত হইয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল,—এরূপ মহাযজ্ঞ, এরূপ মহাদানপুণ্য আর কোথাও কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের জয়শব্দে সকল দেশ পূর্ণ হইল। তদীয় মস্তকে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হস্তিনার রাজসভায় সেই জয়ধ্বনি ও জনকল্লোল ভেদ করিয়া, অকস্মাৎ এক মহাকায়, অদ্ভুতমূর্ত্তি নকুল উপস্থিত হইয়া মনুষ্যভাষায় কহিল,—তোমরা যুধিষ্ঠিরের এ অশ্বমেধের এত প্রশংসাবাদ কেন করিতেছ? কুরুক্ষেত্রে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সহিত এ যজ্ঞের তুলনাই হয় না। নকুলের সেই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া, আগ্রহসহকারে নকুলকে উঞ্ছবৃত্তির কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে এই বৃত্তান্ত বলিয়া-

ছিল। এ প্রসঙ্গে এ স্থলে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—

এই বঙ্গদেশের কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। গৃহে একমাত্র তাঁহার বৃদ্ধা জননী। বৃদ্ধা ভিক্ষা দ্বারা অতিকষ্টে পুত্রকে পালন করিতেন। সে গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী ছিল না। দূরবর্ত্তিনী নদী হইতে অতিকষ্টে সকলকে পানীয় সংগ্রহ করিতে হইত। সে নদী গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় হইত। তখন স্থানীয় লোকের জলকষ্টের সীমা থাকিত না। অগত্যা সকলকে সেই নদীর পঙ্কিল জল পান করিতে হইত। সেই ব্রাহ্মণের মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা বলিতেন,—বাবা! এ দুঃখিনী ত তোমাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, তথাপি, যদি কখনও কোনও উপায়ে অর্থসংগ্রহ করিতে পার, এ গ্রামে একটী পুষ্করিণী কাটাইও। তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা। আমি অনাহারে মরিলেও, এবং তুমি আমার শ্রাদ্ধ করিতে না পারিলেও, আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তুমি এ কার্য্য করিলে, আমার জীবনের সকল কামনা পূর্ণ হইবে, আমার অক্ষয় স্বর্গ লাভ হইবে।

সেই মাতৃবাক্য ব্রাহ্মণের ধ্যান, জ্ঞান ও জপমালা ছিল। অনন্তর মাতার পরলোকগমনে, মাতৃদায়ে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইলেন। গৃহে কপর্দ্দক নাই। একখানি ভগ্ন কুটীর, কয়েকটী পুরাণ বাসন ও কয়েকখানি জীর্ণবস্ত্র ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না। ব্রাহ্মণ সে সমস্তই বিক্রয় করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। কেবল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া, দুইখানি কোদাল ও কয়েকটী ঝুড়ি ক্রয় করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি নিজ বাস্তুভূমিতে স্বহস্তে পুষ্করিণী খনন করিতে লাগিলেন। অন্নাভাবে অনেক সময় তাঁহাকে উপবাস করিতে হইত, এবং গৃহাভাবে যত্র তত্র শয়ন করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার কোনও কষ্টেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অহোরাত্র অবিশ্রান্ত একান্তভাবে মাতৃনির্দ্দেশপালনেই নিযুক্ত। ক্রমে অনাহারে ও অতিশ্রমে তিনি কঙ্কালসার হইলেন। লোকেরা তাঁহাকে "ক্ষেপা বামন" বলিয়া উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ অবশেষে বুঝিলেন,—কোনও ধনীর সাহায্য বিনা, একাকী তাঁহা দ্বারা একটী বৃহৎ জলাশয় হওয়া অসম্ভব। এ কার্য্যের জন্য তিনি অনেকের নিকট ভিক্ষার্থী হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার করুণাপূর্ণ প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিল না। কোনও ধনীর গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে, তাঁহার সেই মলিন, সুজীর্ণ বেশ ও বিশীর্ণ আকার দেখিয়া, দ্বারপালেরা তাঁহাকে গলহস্ত দান করিত। তথাপি ব্রাহ্মণ অক্ষুব্ধ ও নিজ সঙ্কল্প হইতে অবিচলিত।

একদা তিনি শুনিলেন,—কলিকাতা পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ(১) মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রভূত

(১) ভারত-গবর্ণর হেষ্টিংসের সময়, ভূমি ও রাজস্বের বন্দোবস্তকার্য্যে ইনি গবর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

অর্থ দান করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। তখন উক্ত ভবনে শ্রাদ্ধ ও দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। দেওয়ানের কর্ম্মচারী ও তোষামোদকারীরা তাঁহাকে ঘেরিয়া সহস্রমুখে তদীয় দানকীর্ত্তি উদ্ঘোষণ করিতেছিল। তথায় তাদৃশ কৌপীনধারীর প্রবেশ অসাধ্য। বহুচেষ্টায় একদিন তিনি সুযোগক্রমে দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—বিষম জনতা। সকলেই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তদীয় দানকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। ব্রাহ্মণ অকুতোভয়ে কহিলেন,—ইনি এমন কি কার্য্য করিয়াছেন যে, আপনারা ইহাঁকে এত বাড়াইতেছেন? ইহাঁর মাতৃশ্রাদ্ধ, কোনও ক্রমেই আমার মাতৃশ্রাদ্ধের তুল্য নহে। ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া, সকলেই ব্রাহ্মণের উপর রুষ্ট হইল এবং তাঁহার উপর তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেহ কেহ তাঁহাকে তথা হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সদাশয়, গঙ্গাগোবিন্দ সকলকে তিরস্কারপূর্ব্বক, সাদরে ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং বিনয়মধুর বাক্যে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক, আনুপূর্ব্বিক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন্! আপনি আপনার বহুলক্ষ টাকা আয় হইতে কয়েক লক্ষমাত্র মাতৃশ্রাদ্ধে দান করিয়াছেন। আপনার বিশাল জমিদারি, অট্টালিকা, গৃহসজ্জা এবং দাস, দাসী প্রভৃতি সকলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিছুরই অভাব দেখিতেছি না। কিন্তু আমার "নান্নং ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রম্।" আমি ঈশ্বরী মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধে সকলি দান করিয়াছি, একটী মৃৎপাত্রও অবশিষ্ট নাই। গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইয়া, তাঁহার বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সাশ্রুনয়নে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের কথিত ঘটনা সত্য কি না জানিবার জন্য, সে স্থানে নিজ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন, এবং তাহার নিকট ব্রাহ্মণের বিবরণ সত্য জানিয়া, অচিরে সেই গ্রামে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, এবং তাহা সেই ব্রাহ্মণের মাতার নামে উৎসর্গ করিলেন।

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সঞ্জল্পাচ্চ সহাসনাৎ
ধর্ম্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে সিধ্যন্তি চ ন মানবাঃ॥"

অসতের দর্শনে স্পর্শনে—তাহার সহিত আলাপনে ও উপবেশনে মানবের সদাচার অতীব হীনতা প্রাপ্ত হয়। সে কদাচ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। সর্ব্বেন্দ্রিয়—মন—প্রাণ—আত্মার পূর্ণ পবিত্রতা সাধনই প্রকৃত শিক্ষা। প্রাচীনতম বৈদিক

আচার্য্যেরা শিক্ষার্থী শিষ্যকে প্রথমেই এই কয়েকটী বিষয়ে উপদেশ দিতেন। যথা;—

১। "ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম, দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষভির্যজত্রাঃ"—আমরা যেন কর্ণদ্বারা সর্ব্বদা কল্যাণবাণী শ্রবণ করি; চক্ষু দ্বারা সকলি মঙ্গলময় দর্শন করি; স্তুতি মন্ত্রাদি দ্বারা ভগবানেরই স্তব করি।

২। "ওঁ সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্। ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যম্। কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্। ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্। স্বাধ্যায় প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্। দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্।"

—হে শিষ্য! তুমি সত্য হইতে বিচলিত হইও না; ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইও না; ধর্ম্মসাধননিদান শারীরিক কুশল হইতে বিচলিত হইও না; শুভকার্য্য হইতে বিচলিত হইও না; দেবপিতৃ-কার্য্য হইতে বিচলিত হইও না।

৩। "মাতৃদেবো ভব; পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব। যানানবদ্যানি কর্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।"

—মাতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। পিতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। আচার্য্যকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর। শিষ্টসম্মত, নির্ম্মল কর্ম্মসকলের অনুষ্ঠান করিও; নিন্দিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ করিও না। হে শিষ্য! সকলের সদাচারই গ্রহণ করিও। অসৎকার্য্য গুরুজনে করিলেও, তাহার অনুষ্ঠান কদাচ করিও না।

(তৈত্তিরীয়োপনিষৎ)

অহো কি অমূল্য উপদেশ! ব্রহ্মলোকের অমৃতকুণ্ড হইতে যেন বিন্দু বিন্দু অমৃত শিষ্যহৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে। মর মানব ইহার এক বিন্দু পান করিলে, অমর হইয়া যায়। বৈদেশিক কর্ত্তৃক ভারতের ধনরত্ন, ধুলা গুঁড়া পর্য্যন্ত যদি কবলিত হয়, বৈদিক যুগের এই সকল অপার্থিব বৈভব, ভারতের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। হায়! আমরা সেই ভারত-সন্তান আজি স্বদেশশিক্ষার উপাদানের জন্য, প্রত্যেক বিষয়েই, দীনহীন ভাবে বৈদেশিকের কৃপাভিক্ষা করিতেছি!

ধর্ম্মই ব্রহ্মাণ্ডস্থিতির মূল। সত্যময়, অবিকারী সত্যই ধর্ম্মের প্রাণ। সত্যের বিকাশ যে সমাজে যে পরিমাণে হইবে, যে সমাজ উন্নতির দিকে ততই অগ্রসর হইবে। সত্যের জ্যোতি যতই অস্তমিত হইবে,সমাজ ততই অধোগতি লাভ করিবে। "সমাজসংস্কার" অর্থে সমাজে সত্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা। সত্যই সমাজের শক্তি ও ভিত্তি, সত্যের পূর্ণ বিকাশই সমাজের চরমোন্নতি। অনেকের ধারণা যে, বাচনিক সত্য অর্থাৎ শুধু মুখে সত্যকথা বলাকেই "সত্য" বলে। কিন্তু পূর্ণ সত্যের লক্ষণ স্বতন্ত্র। ভগবান্ ব্যাস মহাভারতে সত্যের ত্রয়োদশ আকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা;—(১) যথার্থ ভাষণ; (২) সমতা (সর্ব্বত্র সমদর্শিতা); (৩) দম (ইন্দ্রিয়দমন); (৪) দয়া; (৫)

ক্ষমা; (৬) হ্রী (কুকার্য্যে লজ্জাবোধ); (৭) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা); (৮) অনসূয়া (অন্যের মঙ্গলে আনন্দবোধ); (৯) আত্মত্যাগ (পরার্থে স্বার্থবিসর্জ্জন); (১০) ধ্যান (পরমাত্মচিন্তা); (১১) আর্য্যতা (নিষ্পাপ, পুণ্যময় আচার); (১২) ধৃতি (সর্ব্বাবস্থায় চিত্তের সাম্য ও শান্তি); (১৩) অহিংসা (কায়মনোবাক্যে পরপীড়া-বর্জ্জন)। এই নিত্য ও অবিকারী সত্য সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম। জাতিভেদ, বর্ণভেদ, সাম্প্রদায়িক আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মপ্রণালী-ভেদ প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ আমাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির প্রধান অন্তরায়। দেশের দশা ভাবিবার সময় যখন এ কথাটী মনে পড়ে, তখন হতাশ হইতে হয়। অথচ এ সমস্যার মীমাংসা অতি সহজ কিন্তু চিরপোষিত কুসংস্কারের আবরণে আমরা এরূপ অন্ধ যে, এ সহজ মীমাংসাটী আমাদের মনে স্থান পায় না। এ জগতে যত প্রকার জাতিধর্ম্মগত পার্থক্য আছে, সে সকলি, লোকের বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন ব্যবসায় অনুসারে মনুষ্য কর্তৃক কল্পিত। মূলগত পার্থক্য নাই। পুরুষসূক্তে লিখিত আছে;—

"ন বর্ণানাং বিভেদোঽস্তি সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা নির্ম্মিতং পূর্ব্বং কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥"

—ব্রহ্মনির্ম্মিত ব্রহ্মানুপ্রাণিত এ জগতে বর্ণভেদ নাই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময়। বর্ণভেদ বা জাতিভেদ কেবল কর্ম্মানুসারেই কল্পিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছিলেন;—

"মাতা মে পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তা মে ভবনং ভুবনত্রয়ম্॥"

—ঈশ্বর আমার পিতা, ভগবতী ঐশী শক্তি আমার মাতা, জীবমাত্রেই আমার পরিবার, ত্রিভুবন আমার গৃহ। "বসুধৈব কুটুম্বকম্"—বিশ্বই আমার পরিবার। এ উদার উক্তি হিন্দুশাস্ত্রের পদে পদে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কর্ম্মবিভাগানুসারে জাতি-ভেদ প্রবর্ত্তিত হইলেও, পরস্পর উচ্চ-নীচ, উত্তম-অধম, হেয়-উপাদেয়, এ প্রভেদ করা সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কার্য্য। মনে কর,—মনুষ্যসমাজ একটী পূর্ণাবয়ব জীবদেহ। ব্রাহ্মণ এ সমাজদেহের মস্তক, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য কটিদেশ, শূদ্র পদদ্বয় (১)। এই

---

(১) মস্তক বা মস্তিষ্ক বুদ্ধির ও চিন্তাদির স্থান। সমস্ত সমাজের হিতাহিতচিন্তা, ধর্ম্মাধর্ম্ম-নির্ণয়, কার্য্যের ব্যবস্থা ও উপদেশাদি দান প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকায়, ব্রাহ্মণ 'মস্তক' বলিয়া অভিহিত। কিন্তু শুধু ব্রহ্মবলে সমাজ চলে না, দুষ্ট-দমন ও শিষ্টপালনাদি জন্য বাহুবল চাই। বাহুবলে লোকরক্ষা করায় ক্ষত্রিয় সমাজের 'বাহুস্বরূপ'। ব্যবসা বাণিজ্যাদি লোকজীবিকার উপায়। বৈশ্যেরা সে কার্য্যে দক্ষকক্ষ বলিয়া, বৈশ্য সমাজের কক্ষরূপে অভিহিত। আবার এমন লোক চাই যাহারা নিয়ত পদচারণা অর্থাৎ শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সমাজের সাহায্য করিবে। সেই কার্য্য দ্বারা শূদ্র সমাজের 'পদ' বলিয়া অভিহিত। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

চারিটী বিভাগ লইয়া সমাজ পূর্ণশরীরী। মানবজাতির প্রকৃতি ও ক্রিয়াগত এ বিভাগ যে কোনও নামে বা আকারে সর্ব্বত্র আছে ও থাকিবে। কোনও অঙ্গের অভাব হইলে, সমাজ বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে। যখন একই উদ্দেশ্যে প্রত্যেকেরই উপযোগিতা, যখন মস্তক না থাকিলে দেহ থাকে না, হস্তপদাদি না থাকিলেও দেহ চলে না, তখন ঐ সকলের উৎকর্ষাপকর্ষভেদ কোথায়? মনে কর,—২×৫০=১০০; এ স্থলে শতসংখ্যারূপ গুণফলের উৎপত্তিবিষয়ে দুই ও পঞ্চাশ—উভয়েরই কি তুল্য উপযোগিতা নাই? প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক পদার্থই এ সমাজ-শরীরের এক একটী অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই পাঞ্চভৌতিক বিশ্ব সেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্" সচ্চিদাত্মা পরম ব্রহ্মের কৃতি ও কীর্ত্তি। এই বিশ্বের প্রতি অণু-পরমাণুতে তাঁহারি বিভূতি, তাঁহারি করুণা, তাঁহারি মঙ্গলভাব ওতপ্রোতভাবে জাজ্বল্যমান। বাদবিসংবাদ ছাড়িয়া শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে ও অভিনিবিষ্টভাবে এই ব্রহ্মাণ্ড-কাণ্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সকল বাধা, সকল ভেদ ও সমস্ত বিরোধ ঘুচিয়া যায়, তখন ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে বলিতে হয়;—

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"
"একো বশী নিষ্ক্রিয়াণাং বহূনাং
একং বীজং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥"
(শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ)

এই জন্যই,—

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

ভ্রমান্ধ মানবেরা জগতে এই জাতিভেদ লইয়া, সোদরনির্ব্বিশেষ সজাতীয়গণের উপর যে বীভৎস, লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে, "অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্"—পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতির আদিম জাতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যজাতির এবং ভারতের চণ্ডাল, পরিয়া প্রভৃতির উপর জ্ঞানাভিমানী হিন্দুজাতির অত্যাচারের কথা শুনিলে হিমশিলাও অগ্নিময় হয়, হিমাদ্রিও বিচলিত হয়। মাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিরা সে সব বীভৎস কাণ্ড মনে করিলেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

(ক্রমশঃ।)

'চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ'।
—লোকের গুণ, রুচি ও শক্তি প্রভৃতি অনুসারে কর্ম্মবিভাগ করিবার জন্যই আমি চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলাম।

কমলার পুরস্কার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

মূর্চ্ছাপগমে কমলা উঠিয়া বসিল। রাহুগ্রাস হইতে সদ্যোমুক্ত পূর্ণ শশী তেমন সুন্দর কি? না। নির্ম্মল গঙ্গা-স্রোতে হঠাৎ মৃৎপিণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িলে যে মলিন প্রবাহ উৎপন্ন হয়, ক্ষণ পরে সেই মলিনতা অপসারিত হইলে জাহ্নবীজল যেরূপ প্রসন্নতা লাভ করে, সেইরূপ কি? না। কমলার যৌবনোজ্জ্বল লাজরক্ত বদন-মণ্ডল নিদাঘপ্রাতে সদ্যঃস্নাত প্রফুল্ল শত-দলের ন্যায় সুন্দর দেখাইতে লাগিল। সুশীলকুমার অনিমেষে সেই মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। তিনি ভাবিতেছেন,—তিনি কোথায়? স্বর্গে না মর্ত্ত্যে? মিলনের পর পরস্পরে পরস্পরের নিকট দুঃখের কথা বলিতে লাগিলেন। সুশীল-কুমারের পীড়ার সংবাদে কমলা মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, এবং তাহারই চিকিৎসার জন্য সুকুমার সপরিবারে কলিকাতায় আসেন ও তথায় নারিকেলফলে জলসঞ্চারের ন্যায় তাঁহাদের সকলের অজ্ঞাতে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী ফিরিয়া আসেন। ক্রমশঃ কমলা কিছু সুস্থ হইলে জননীর নিদারুণ কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব মিঃ ঘোষকে নিযুক্ত করা হয়। ভাগ্য যখন সুপ্রসন্ন হয়, তখন সহজেই কার্য্যসিদ্ধি হয়। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় সংগ্রহ হইলে পর সুশীলকুমারকে পত্র লেখা হয়। ঐ পত্র কমলার সুখের জন্য শেষ চেষ্টা। কারণ কমলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞা-বদ্ধা হইয়া মাতাকে বলিয়াছিলেন যে, প্রাণ থাকিতে তিনি সুশীলকুমার ভিন্ন আর কাহাকেও বিবাহ করিবেন না। সুশীলকুমার যে সে সময়ে ঘোর উন্মত্ত, তাহা সুকুমার বা তাঁহার জননী বা কমলার অজ্ঞাত ছিল না। কমলা সেই উন্মত্তকেই পতিত্বে বরণ করিতে লালায়িতা। এদিকে সুকুমারের ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হওয়াতে কত ব্রাহ্মণবংশের তিলকস্বরূপ উচ্চ উচ্চ গ্রাজুয়েটগণ কমলার পাণিপ্রার্থী, তবুও কমলা সে সকল প্রস্তাবে বধির। কমলার হৃদয় সুশীলকুমারকেই চায়। উপায়ান্তর-বিহীন হইয়া সুকুমার উন্মত্ত সুশীলকুমারের হস্তে ভগিনীকে প্রদান করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইয়া এটর্নীকে দিয়া পত্র লেখান। এখন তাঁহাদের কি আনন্দ! সুশীলকুমার সম্পূর্ণ নীরোগ, সম্পূর্ণ সুস্থ। তিনি উচ্চ রাজপদস্থ, তিনি মহাসম্মানভাজন। ধন্য কমলা! তুমিই সাবিত্রী ও রুক্মিণীর নাম রক্ষা করিলে। তোমার ন্যায় নারী আজিও ভারতে আছে বলিয়া, আমাদের মধ্যে তোমাদের মত ভগিনী দুই একটী আছে বলিয়া আজিও আমরা ধন্য হইতেছি।

সুশীলকুমারের পিতা ক্রমশঃ সমস্ত

অবগত হইলেন। আহ্লাদে সকলের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। মহা সমারোহের সহিত উভয় পক্ষ শুভ পরিণয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এই বিবাহে টাকা, কড়ি, তৈজস, পত্র, আদান-প্রদানের কোন তালিকা বহির্গত হইল না। পরস্পর আনন্দে উভয় পক্ষ অধীর। এই পুণ্যময় বিবাহের কাহিনী সংকীর্ত্তন করিয়া আজি লেখনী পবিত্র হইল। ভগবান্ আশীর্ব্বাদ করুন যে, বঙ্গের প্রত্যেক বিবাহ এইরূপে কেবল হৃদয়ের আদান প্রদান লইয়া—উভয় আত্মার মিলনের মহোৎসবরূপে আচরিত হউক।

একদিন সুশীলকুমার অপরাহ্নে সুকুমারের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত। বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই। বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার সাক্ষাৎ এ যুগে বেশ প্রচলিত হইয়াছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আবার তাহারা পূর্ব্বপরিচিত। কমলা ও সুশীল একত্র হইলেন। সুশীল হাস্যমুখে বলিলেন,—"কমল, আজ আমি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিতে আসিয়াছি। মনে পড়ে, আমি তোমাকে পুরস্কার দিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম। তোমার শিক্ষা ও চরিত্রের যে উজ্জল অভিজ্ঞান আমি পাইয়াছি, তাহার তুলনা বিরল,—তাহার উপযুক্ত পুরস্কার এ পৃথিবীতে নাই, আমি কোথায় পাইব? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আজ আমি তোমাকে পুরস্কার দিতে আসিয়াছি, এই লও তোমার পুরস্কার—এই বলিয়া একটী সদ্য প্রস্ফুটিত শতদল কমলার দক্ষিণ হস্তে দিলেন।

অরুণকিরণপ্রদীপ্ত শিশিরস্নাত সদ্যঃপ্রফুল্ল শরৎকমলতুল্য কমলার কমনীয় মুখমণ্ডল মৃদু হাস্যে আলোকিত হইয়া উঠিল। স্বভাবরক্তিম কপোল লজ্জায় অধিকতর রক্তিম ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল। কমলা যেন সত্য সত্যই ক্ষীরসমুদ্রসমুদ্ভূতা কমলার ন্যায় ভুবনমোহিনীরূপ ধারণ করিলেন। সুশীলকুমার আনন্দে বিহ্বলচিত্তে নয়নদ্বয় বিস্ফারিয়া একতানমনে যেন সেই অগাধ অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপরাশি পান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি বলিলেন,—"কমলা! যতদিন এই দেহে প্রাণ থাকিবে, যতদিন এই আত্মার অস্তিত্ব থাকিবে, যতদিন আমার অনুভবের সত্তা থাকিবে, তত দিনের নিমিত্ত এই অধম তোমার নিকট বিক্রীত হইল। তোমার চরিত্র-রত্ন দ্বারা ক্রীতদাস স্বরূপ ইহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার জীবন সার্থক কর।

* * * *

সুশীলকুমার কৃতার্থ হইলেন; কমলা কৃতার্থ হইলেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজন কৃতার্থ হইলেন। এই বিবাহ কি কন্যার পক্ষে, কি তাহার মাতার পক্ষে, কি অপর সকলের পক্ষে, সকলের পক্ষেই সমান প্রীতিকর হইয়াছিল। কারণ পাত্র রূপে, ধনে, বিদ্যায়, কুলমর্য্যাদায় অতুলনীয় ছিলেন এবং মিষ্টান্ন বিতরণেও তিনি মুক্তহস্ত হইয়াছিলেন।

হায়! এই দুঃখদারিদ্র্যময় মৃত্যুভয়সঙ্কুল জগতে এরূপ ভাগ্য কয় জনের ঘটে! দয়াময়! তুমিই জান এরূপ পুরস্কারের মূল্য কত!

শ্রীমতী চারুশীলা মিত্র।

মা! আমি তোমার ছেলে।

১

মা! আমি তোমার ছেলে;
যা করি না খেলে ধূলে।
অকর্ম্ম কুকর্ম্ম করি রাঙ্গা পদতলে;
কোন কালে ছাড় নাই, মা নিকাশ নিলে॥

২

কি মায়া মোর মার প্রাণে!
তবু থাকি চরণকোণে!
ভাল কথা শুন না মা!
জ্বলতে থাক মন্দ শুনে.
তবু স্নেহে চেয়ে দেখ অভাগার পানে!

৩

সবে জ্বলে আমি না ত জ্বলি;
যবে হবে মোর হাড় কালী;
ডঙ্কা মেরে চলে যা'ব,
মুক্তি দিবে পদধূলি,
রবে না মনের ক্ষোভ জয়পতাকা তুলি।

৪

নাই দিয়ে খেয়েছ মোর মাথা;
সঙ্গদোষে শুনি না সাধুকথা;
সাধুসঙ্গ যাতে রাখি
পদধূলি মাথে মাখি
এই ভিক্ষা চাই মাগো!
শাস্তি দাও মুক্তি দাও আমি যোগ্য যথা।

শ্রীনকুড় চন্দ্র বিশ্বাস।

আলমোড়া ভ্রমণ।

পরদিন ২০শে কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, প্রভাতে উঠিয়া আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম। মুখ হাত ধুইয়া সকলে জলযোগ করিয়া জিনিষ পত্র আবার বাঁধিয়া লইলাম। রামগড় একটী পার্ব্বত্য গণ্ডগ্রাম, দূরে দূরে দুচারখানি দোকান আছে, এবং কয়েক ঘর অধিবাসীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ দেখিতে পাওয়া গেল। এক অনতি-উচ্চ পর্ব্বতের গায় ডাকবাংলাটী নির্ম্মিত, তার চারি দিকে কেবল পাহাড় ও বৃক্ষশ্রেণী। ৮টার মধ্যেই আমরা রামগড় ত্যাগ করিলাম। কি সুন্দর পার্ব্বত্য পথ! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিনদী অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া গেল। শীতকাল বলিয়া তখন জল শুকাইয়া গিয়াছে। বর্ষায় এই সকল নদী জলপূর্ণ হইলে যে কি শোভা বিস্তার করে, তাহা অনুমানে বুঝিতে পারিলাম। গম্ভীর পর্ব্বতশ্রেণী স্তরে

স্তরে সাজান; পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তার উপর পর্ব্বত অসীম,—অনন্ত,—আশে পাশে যে দিকে দেখ, কেবল পাহাড়। পাহাড়ের গায়ে গায়ে যেন কেহ বৃক্ষশ্রেণী সাজাইয়া দিয়াছে। কোথাও এক দিকে অভ্রংলিহ বিরাট্ পর্ব্বতমালা, অন্য দিকে অতলস্পর্শ বিশাল খড্ বা নিম্নভূমি, দেখিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। মধ্যে পর্ব্বত-গাত্র দিয়া আমরা চলিয়াছি। মরি! মরি! কি সুন্দর সে দৃশ্য! আর কখনও বুঝি তেমন দেখিব না। দাণ্ডির নাড়াতে সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হইয়াছে, দুই দিনের অনাহারে শরীর ক্লান্ত, তবু পাহাড়ের যে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে পথের সমস্ত কষ্ট ভুলিয়া গিয়াছি। কি সুন্দর! কি সুন্দর! কি সুন্দর! অধিত্যকায়—উপত্যকায়—স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের শব্দ,—স্থানে স্থানে গিরিনদীর কুলুকুলু ধ্বনি—দেখিয়া দেখিয়া আশা মিটিতেছিল না। হে মহিমময় জগদীশ! তোমার সৃষ্টিবৈচিত্র্য ও অপূর্ব্ব মহিমদর্শনে প্রাণ পুলকিত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবমুগ্ধ হইয়া বিশ্বস্রষ্টার চরণে বার বার প্রণাম করিলাম। পার্ব্বত্য নদী প্রবাহিত হইয়া যেখানে যেখানে গন্তব্য পথ রোধ করিয়াছে, গভর্ণমেণ্ট সেই সেই স্থানেই লৌহসেতু বা ঝোলার পোল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পথে আমাদের এইরূপ ৪।৫টি ঝোলার পোল পার হইতে হইয়াছিল।

বেলা ১টার সময় আমরা পিউরা ডাকবাংলায় পৌছিলাম। বাহকেরা আহারাদি করিতে লাগিল। আমরা আর রন্ধন করিলাম না, একটু বিশ্রাম করিয়া এদিক্ ওদিক্ বেড়াইতে লাগিলাম। পিউরা অতি ক্ষুদ্র স্থান, এখানে কোনও দোকান নাই, লোকের বসতিও নাই। একটি অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গের উপর পিউরা ডাকবাংলা নির্ম্মিত। পিউরা হইতে আলমোড়ার দৃশ্য বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। পিউরা হইতে আলমোড়া ১০মাইল পথ। পিউরায় আমরা, মধ্যাহ্নের রৌদ্রেও অত্যন্ত শীত বোধ করিলাম। বিশ্রামান্তে বেলা ৩টার পর আমরা পিউরা ছাড়িয়া আবার চলিলাম। পথে আবার সেই মনোরম দৃশ্য! ক্রমে যতই অগ্রসর হইতেছিলাম, গিরিরাজের মনোমোহন সৌন্দর্য্যে ততই মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। পাহাড়ের গায়ে গায়ে কেবল পাইন বৃক্ষের শ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ওক গাছ, তদ্ভিন্ন আর কোনও বৃক্ষ এস্থানে দেখিতে পাওয়া গেল না। সন্ধ্যা ৬৷৷ টার সময় আমরা আলমোড়ায় পৌছিলাম। কাকাবাবু ৩মাইল পথ অগ্রসর হইয়া আমাদের আনিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। তিনি আমাদিগের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার অতুল স্নেহে ও যত্নে আমাদের কোন কষ্ট হইল না। পথে আসিতে আসিতে যেমন শীত বোধ হইতেছিল, আলমোড়ায় পৌছিয়া তেমন ঠাণ্ডা বোধ হইল না। আমরা আলমোড়ায় আসিবার সপ্তাহ পরে কাকা

বাবু কার্য্য উপলক্ষে আলমোড়া ত্যাগ করিয়া গেলেন।

আলমোড়া বহু পুরাতন সহর,—পার্ব্বত্য হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল। এ প্রদেশের পৌরাণিক নাম কূর্ম্মাচল. আধুনিক কুমায়ুন হইয়াছে। শুনিলাম ১০১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা কুমায়ুন প্রদেশ জয় করেন। তৎপূর্ব্বে এ প্রদেশ ২০ বৎসর নেপালের অধিকারে ছিল। তার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ রাজার রাজত্ব ছিল। সে সময় নাইনিতালের অস্তিত্ব ছিল না। তখন আলমোড়াই রাজধানী ও পার্ব্বতীয় প্রধান সহরমধ্যে গণ্য হইত। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে নাইনিতাল পর্ব্বতে ইংরাজগণ বাসভূমি নির্ম্মাণ করেন। সেই অবধি এখন নাইনিতালই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। নেপালের হস্ত হইতে কুমায়ুন প্রদেশ জয় কালে আলমোড়ারই একজন ব্রাহ্মণ অধিবাসী ইংরেজের সহায়তা করেন। শুনিলাম তাঁহার বংশধরেরা অদ্যাপিও বৃত্তি ভোগ করিতেছেন। আলমোড়া ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান। এখানকার অধিবাসিবর্গের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত এবং সজ্জন। প্রাচীন কালের মত অদ্যাপিও এখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র, এই চারি জাতি বাস করেন ও গণনীয় হইয়া থাকেন। আলমোড়ায় ইতর ভদ্র প্রায় সকলেই বেশ সদাচারী, শান্তপ্রকৃতি ও বিনয়ী। প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের চিহ্ন এখানে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সাহেব মেম এখানে তেমন দেখা গেল না, ইংরাজ অধিবাসী খুব কম। আলমোড়ায় বেশী নির্ঝর না থাকায় জলকষ্ট আছে, গভর্ণমেণ্ট বহু কৌশলে বহুকষ্টে দূরস্থ জলাশয় লইতে পাইপ দ্বারা জল আনাইয়া সহরে সরবরাহ করিতেছেন। এখানে অবরোধ-প্রথা নাই, ভদ্রস্ত্রীলোকদেরও পরদা নাই। ধনিগৃহের গৃহলক্ষ্মীরাও কলসী মাথায় লইয়া রাজপথে জল আনিতে যান। রমণীরা অত্যন্ত পরিশ্রমী. দাসী চাকর প্রায় কাহারও বাটীতে নাই, গৃহলক্ষ্মীরাই স্বহস্তে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রভাতে উঠিয়া স্নান, পূজা সমাপনানন্তর রমণীগণ গৃহমার্জ্জন, জলতোলা, বাসনমাজা, রন্ধন প্রভৃতি কার্য্যের অবসরে, ক্ষেত্রকর্ম্ম চাষ বাস প্রভৃতি কার্য্য করেন। আলমোড়ার যতগুলি অধিবাসীর গৃহ দেখিয়াছি, রমণীদের শ্রমপটুতা ও যত্নে গৃহ ও প্রাঙ্গণগুলি এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, যেন ছবির মত;—দেখিলে আনন্দ হয়। এখানে ভিক্ষুক বা গৃহহীন, অন্নহীন কাহাকেও দেখিলাম না; নিতান্ত দরিদ্র যাহারা,—তাহাদেরও একটু ক্ষেত আছে, দুই চারিটী গাই বলদ আছে, একটু বাসস্থান আছে,—ডাণ্ডির কুলিরা সব এই শ্রেণীর লোক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থের রমণীরাও মাঠে গোচারণে গমন করিয়া থাকেন। গোধূলির সময়ে যখন পর্ব্বতশিখরে দাঁড়াইয়া, গাভীগণকে গৃহ-প্রত্যাগত হইবার জন্য ব্রাহ্মণকুমারীদের মধুর আহ্বানধ্বনি শুনিতাম,—কাহারও গাভীর নাম লক্ষ্মী, কাহারও গাভীর নাম কালিন্দী,—প্রফুল্লমুখী কিশোরীগণ

যখন আদরের সহিত ডাকিত,—"আ লছ-মিয়া! আ, আ কালিন্দি—যমুনা! যরশে আ," তখন অতীত যুগের তপোবনের পুণ্য দৃশ্য আমার স্মৃতিপথে জাগিয়া উঠিত। আলমোড়া খুব স্বাস্থ্যপ্রদ স্থান, ক্ষয়কাশ ও গ্রহণী প্রভৃতি পুরাতন দুঃসাধ্য রোগ এখানে ভাল হইয়া যায়, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু দুর্গম পথক্লেশ সহ্য করিয়া এবং প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া সাধারণের পক্ষে এত দূরদেশে আসিবার সুবিধা হয় না বলিয়া বোধ হয় সচরাচর কেহ আল-মোড়ায় যাইতে পারে না।

আলমোড়া ছোটখাট বেশ সহর, একটি উচ্চ পর্ব্বতের শিখরদেশে এখানকার প্রধান বাজার রোড নির্ম্মিত, তার দুপাশে উচ্চাবচ স্থানে স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের বসতি,—বাড়ী ঘর দূর হইতে দেখিতে বেশ সুদৃশ্য। এখানে স্কুল, কলেজ, কাছারি প্রভৃতি সব আছে, হিন্দু বালিকাবিদ্যালয়ও সম্প্রতি হইয়াছে। আলমোড়ার পূর্ব্বতন ব্রাহ্মণ রাজবংশধরকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখানেই কাটরোডের পার্শ্বে খানিকটা ভূমিতে বাসস্থান ও বৃত্তি দিয়া রাখিয়াছেন। আলমোড়ার অনেক পথই পাথর দিয়া বাঁধান, পুরাতন হিন্দুরাজার নির্ম্মিত। প্রায় একক্রোশব্যাপী প্রধান বাজার রোডটী এমনি সুচারুরূপে প্রস্তরের দ্বারা নির্ম্মিত যে, দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়, সমতল ভূমিতে প্রায় এ রকম পাথর দিয়া বাঁধান পথ কোথাও বোধ হয় নাই। কত শতাব্দী অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ পথটি আজিও অক্ষতভাবে বিদ্যমান থাকিয়া ব্রাহ্মণরাজত্বের অক্ষয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

বাজাররোডের মধ্যেই কতকগুলি দেবদেবীর মন্দির আছে। আমরা নিম্ন-লিখিত মন্দিরগুলি দর্শন করিয়াছি;—শীতলা দেবীর মন্দির, বদরীনারায়ণের মন্দির, লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির, কাল-ভৈরবের মন্দির, রামমন্দির, হনুমানের মন্দির ও নন্দাদেবীর মন্দির। সকল মন্দিরগুলিই শুনিলাম, হিন্দু রাজগণের দ্বারা নির্ম্মিত। বদরীনারায়ণের মন্দির শুনিলাম ৫০০ শত বৎসরের পুরাতন, কাটিহারের রাজা কর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়া-ছিল।

একদিন আমরা রামধারা, লছমনধারা দেখিতে গেলাম। আমাদের বাসা হইতে নিম্নপ্রদেশে প্রায় দুই মাইল দূরে, বিস্তর চড়াই ওৎরাই পার হইয়া পৌঁছিলাম। দুটী অন্তঃসলিল পার্ব্বত্য নির্ঝর ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে। লছমনধারার জল একটা বাঘের মুখাকৃতির ভিতর হইতে বাহির হইতেছে, এবং রামধারার জল অমনি নল বহিয়া ধীরে ধীরে পড়িতেছে দেখিলাম। স্থান দুটী মন্দিরের মত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বোধ হয় জলাশয়দুটী নির্ম্মল রাখিবার জন্য, পূর্ব্বতন কোন রাজা এইরূপে প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। শুনিলাম, এ দুইটী জলধারা বহুশতাব্দী যাবৎ এই প্রকারেই বহিতেছে, ইহাদের জল কখনও শুষ্ক হয়

না, এবং এতদপেক্ষা কোন কালে জলের বৃদ্ধিও হয় না। স্থানটী বড় সুন্দর, চতুর্দ্দিকে গভীর পর্ব্বতশ্রেণী। শত শত বৎসর যদি কেবল পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়া বেড়ান যায়, তথাপি বুঝি অসীম হিমাদ্রির আদি অন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। পার্ব্বত্য প্রদেশের এমনি মহিমা যে, সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হয় না, যত দেখ আরও দেখিতে ইচ্ছা করে। নীচে নীচে পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা গেল। নিকটবর্ত্তী একটি গ্রামে নির্ম্মলা ও আমি বেড়াতে যাইব ভাবিলাম, কিন্তু আমাদের সঙ্গী পথপ্রদর্শক বলিলেন, উপর হইতে দেখিতে গ্রামখানি নিকটে দেখাইতেছে বটে, কিন্তু উহা এক ক্রোশেরও অধিক দূরবর্ত্তী। তখন সন্ধ্যা হইয়া অসিতেছিল, সুতরাং আর আমাদের গ্রামে যাওয়া হইল না, ক্ষুণ্ণমনে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

এখানে পাহাড়ের ভিতরে ভিতরে যে যে স্থানে অন্তঃসলিলা নির্ঝরিণী প্রবাহিত হইতেছে, সেই সেই স্থানে পাহাড়ের অঙ্গ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকারে কাটিয়া কূপের মত জলপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছে এবং সেই জল নির্ম্মল রাখিবার জন্য সে স্থানগুলিতে মন্দিরের মত পাথরের ঘর নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ক্ষুদ্র জলাশয়কে এ প্রদেশে নওলা বলে। নওলার জল কখনও হ্রাস পায় না। এখানে এইরূপ নওলা অনেক আছে, এ সকল হিন্দুরাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন।

(ক্রমশঃ)

২য় বার্ষিক স্মৃতি-পূজা।

যুগল বরষ পূর্ণ তাপসপ্রবর !
গিয়েছ অমরধামে—আঁধার সংসার ॥
কোথা সে পুণ্যের প্রভা ? কোথা সে
স্নিগ্ধতা।
যে প্রভাবে পলাইত সব আবিলতা ॥
ব্রহ্মশক্তি কর্ম্মবল কে দেখাবে বল ?
মহা-ঋষি ! তব তরে ঢালি অশ্রুজল ॥
লহ লহ উপহার ক্ষুদ্র হৃদয়ের।
তব পূজা-যোগ্য হায় ! কি আছে মোদের ॥
সাধনার বলে সিদ্ধি লভি এ ধরায়।
পুণ্য প্রেম বিতরিয়া গেছ অমরায় ॥
ও পূত পরশে পাপী পেয়ে নব বল।
ও চরণে স্থান লভি হত সুশীতল ॥
দীন-হীন-বন্ধো ! আছ কোথা দেব তুমি ?
শ্মশান এ ধরাধাম প্রাণহীন আমি ॥
জীবন্ত বিশ্বাস রূপে ছিলে বিদ্যমান।
তব বলে হইতাম সদা বলীয়ান্।
এ ভবে যা শ্রেষ্ঠ ধন করিয়াছ দান।
মোহ-মুগ্ধ প্রাণে দিছ নব জাগরণ ॥
ও আঁখি পাপীর দুঃখে সদা ছল ছল।
এখন আশ্রয় ভবে কেবা দেয় বল ?
ভবের এ বেলাভূমে নিরাশা লইয়া ;

রহিব কি বিশ্বাসের শক্তি পাসরিয়া ॥
"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" থাকিবে অটল।
এই ভবে পূত নাম রহিবে উজ্জ্বল ॥
শ্রেষ্ঠ লোকে সুখে আছ তাপসপ্রবর!
হীন মৃত প্রাণ মাঝে জীবন সঞ্চার ॥

স্বর্ণপ্রভা বসু।

নূতন সংবাদ।

১। প্রাচীন গ্রীক জাতির বিবাহবন্ধন। সম্প্রতি গোটিনজেন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের পত্রিকায় এই বিবাহবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে (১)। এই বিবাহ খৃষ্টশকের তিন শত এগার বর্ষ পূর্ব্বের ঘটনা। এ বিবাহের পাত্র — দিগ্‌বিজয়ী সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের পুত্র হিরাক্লাইডিস্, এবং পাত্রী স্থানীয় কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, তাঁহার নাম ডেমিট্রিয়া। এ বিবাহে পাত্রীকে তৎকাল-প্রচলিত সহস্র মুদ্রা মূল্যের বস্ত্রালঙ্কার পণস্বরূপ পাত্রকে দিতে হইয়াছিল। নবদম্পতীর বাসের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান পাত্র ও কন্যাপিতার নির্ব্বাচন অনুসারে স্থিরীকৃত হইল। উক্ত বিবাহের নিয়ম এই,—জায়া ও পতির মধ্যে যদি কেহ বৈবাহিক নিয়ম ভগ্ন করেন, তবে উভয় পক্ষের নির্ব্বাচিত মধ্যস্থ দ্বারা সে বিবাদের ভঞ্জন হইবে। সালিসির বিচারে যদি স্বামীর অপরাধ সপ্রমাণ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবে, এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ স্বামী সেই বিবাহ-যৌতুকস্বরূপ লব্ধ সহস্র মুদ্রা পত্নীকে প্রত্যর্পণ করিবেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এক সহস্র রৌপ্যমুদ্রাও দিতে হইবে। বিবাহকালীন এই চুক্তি-পত্রে ছয় জন গণনীয় সাক্ষীর নাম লিখিত ছিল।

২। শুভ সংবাদ — বামাবোধিনীর জন্মের পূর্ব্বে স্ত্রীজাতির বিদ্যানুশীলন এদেশে ঘোর কুসংস্কার বলিয়া পরিগণিত ছিল। আজি মঙ্গলময় ঈশ্বরের কৃপায় সেই অশেষ মঙ্গলমূল স্ত্রীশিক্ষার ঈদৃশ অভাবনীয় উৎকর্ষ দর্শনে কে না পুলকিত হইবেন? এ স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তক ও প্রধান সহায় বামাবোধিনীর সম্পাদক সেই পুণ্যশ্লোক স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তকে কে না কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণ করিবেন? এ বৎসর যে সকল বঙ্গমহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছে, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

প্রথম বিভাগ (First Division.)

১। এলা বিনোদবালা বন্দ্যোপাধ্যায়
ডিওসেসন্ মিসন্ হাইস্কুল, বালিগঞ্জ।
২। দাসী বসু লরেটো হাউস্।
৩। শীলা বসু, লরেটো হাউস্।
৪। লাবণ্যলতা চন্দ, আলেগজেণ্ডার গারলস্ হাইস্কুল, ময়মনসিং।

---

(১) এই বিবরণ একপ্রকার সুদৃঢ় ধাতুফলকে খোদিত। ইহা এক্ষণে বার্লিনের মিউজিয়মে রক্ষিত।

৫। রতনমণি চট্টোপাধ্যায়, বালিরিভাস্ টম্‌সন্‌স্কুল।

৬। নিশামণি দাস, মিসন্ এইচ. ই. স্কুল, কটক।

৭। শোভা মুখোপাধ্যায়, ইডেন ফিমেল্ স্কুল, ঢাকা।

৮। ক্লারাইন্ রাহা, কলিকাতা গারল্‌স্ হাইস্কুল.

৯। ক্ষেমদা রায়, ব্রাহ্ম গারল্‌স্ স্কুল।

১০। আশালতা সেন, ইডেন ফিমেল স্কুল ঢাকা।

১১। কুসুমকুমারী সরকার, ইউ, এফ.সি, অফ স্কটলণ্ড এইচ স্কুল।

দ্বিতীয় বিভাগ (2nd. Division.)

১। লীলালহরী ভট্টাচার্য্য, আলেক-জেণ্ডারস্ গারল্‌স্ স্কুল, ময়মনসিং।

২। সরোজবালা বসু, ইডেন ফিমেল স্কুল, ঢাকা।

৩। সরোজবালা হালদার, ইউ, এফ্. সি. অফ স্কট্‌লণ্ড এইচ্. স্কুল।

৪। নর্ম্মদা কর, প্রাইভেট্ ষ্টুডেণ্ট, রোল্ কটক এফ পি।

৫। এডেলাইন কুসুমকুমারী মিত্র, ডিওসেসন্ মিসন্ হাই স্কুল, বালিগঞ্জ।

৬ শৈলবালা সিকদার, ওয়ানস্ ইউনিয়ান মিসন স্কুল্।

৭। অম্বুবালা সিংহ, ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল, কলিকাতা।

৮। তেজোময়ী সরকার, ক্রাইষ্ট চার্চ স্কুল, কলিকাতা।

তৃতীয় বিভাগ (3rd. Division.)

১। চমৎকারিণী লাহিড়ী, এল, এম, এস, গারল্‌স, স্কুল, ভবানীপুর।

২। লাভ্‌ডে জার্ট্রুড কনকলতা, ডিওসেসন্ মিসন্ এইচ ই স্কুল।

৩। বসন্ত রুদ্র, ক্রাইষ্ট্ চার্চ স্কুল, কলিকাতা।

৪। হেন্‌রিয়েটা অবলাবালা সরকার, ডিওসেসন মিসন হাই স্কুল।

বামা-রচনা।

বিলাপ-গাথা।

(৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধবাসরে পঠিত)।

বিস্তীর্ণ আঁধার দেশে প্রভাততারার বেশে,
ছিলে দেব, বিরাজিত সৌম্য সমুজ্জ্বল।
ধরম-করম ক্ষেত্র, রাখিত আশার নেত্র,
চাহিত তোমারই দ্যুতি, স্নিগ্ধ নিরমল।

স্পর্শেনি কলঙ্ক তায়, পূত দেবশিশুপ্রায়,
করেছে সে জ্যোতি শুধু হৃদয় রঞ্জন;
বাছে নাই ধনী-দীন, ঢালিয়াছে চিরদিন,
কাঙ্গাল বধির মূকে, স্নেহের কিরণ।

দুরবল হীন যারা, তব স্নেহ অশ্রুধারা
পড়িত তাদের ই শিরে হইয়ে অমৃত,
নগণ্যা রমণীতরে, সর্ব্ব শক্তি অকাতরে,
তাই করিয়াছ ক্ষয় প্রভো! পুঞ্জীকৃত।

জ্ঞানহীনে দিতে জ্ঞান, নিরক্ষরে বিদ্যাদান,
ধর্ম্মান্ধ জনের হ'তে পথপ্রদর্শক;
অবনীতে আগমন, করেছিলে মহাত্মন্,
জ্ঞান-ভক্তি করমের সরল সাধক।

পিয়ে বিভুনাম-সুধা, মরতের যত ক্ষুধা,
মিটাইলে অনায়াসে বাসনা কামনা;
শিব-সত্য-রূপ ভাতি, জপি হৃদে দিবারাতি
ক'রে তাঁর (ই) প্রিয় কার্য্য করিলে সাধনা।

স্বদেশে বিদেশে আর, কর্ম্মস্থানে অনিবার,
ছিল যত সাধু কার্য্যে কি সহানুভূতি!
সারাটী জীবন হবি, আকাঙ্ক্ষা উদ্যম সবি,
দেশহিতে পুণ্যে ধর্ম্মে দিছিলে আহুতি।

তথাপি বিনয় কত, দর্প গর্ব্ব লাজে নত,
ধরাতে বিরল হেন নীরব সাধক,
দীনতায় অলঙ্কৃত, চিত্তখানি অবিকৃত,
হৃদে প্রধূমিত সদা স্বর্গীয় পাবক।

হেন নরদেব তুমি, আঁধার জনমভূমি,
কোথা কোন দেবলোকে পড়িয়াছ খসি,
যে বিমল পুণ্য প্রভা, বঙ্গ করেছিল শোভা,
রাখি তার স্মৃতিটুক্ সুবিমল রশ্মি।

কত কার মর্ম্মস্থল, দহিছে এ শোকানল
তেঘোরের শ্রমজীবী করে হাহাকার,
হরিনাভি, নিবাধই, মরমে মরিয়া ওই,
ঢালিছে শোকের অশ্রু আহা, অনিবার।

বোধাকাণা, ছাত্রগণ, করে অশ্রু বরিষণ,
বিদ্যালয় তাহাদের হ'ল্ যে অনাথ,
সিটিকলেজের তরে কে খাটিবে প্রাণভরে,
সে যে করিতেছে আজ তপ্ত অশ্রুপাত।

বামাবোধিনীরে আর কে পরাবে চারু হার
সাজাবে তাহার অঙ্গ প্রবন্ধ রতনে,
পিতৃস্নেহ সুধাধার, কে দিবে নারীরে আর,
কে হবে কৃতার্থ তার উন্নতিসাধনে।

ব্রাহ্মসমাজের হিতে একপ্রাণ একচিতে
কে করিবে বিসর্জ্জন আত্মসুখরাশি,
আত্মার কল্যাণ তরে, স্নেহ ভরে ঘরে ঘরে,
কে ডাকিবে পরমাত্মা নিত্য অবিনাশী।

করি সব সমাপন, গেলে পুণ্য নিকেতন,
হবে কি কখন পূর্ণ তব শূন্য স্থান?
তুমি নাই এ ধরায়, মানেনাকো হিয়া হায়!
কেঁদে উঠে শতবার দীন ভগ্ন প্রাণ।

স্নাত হয়ে ভক্তিনীরে, আহা ধরিয়াছি শিরে
ও পবিত্র পদরজঃ কিছুদিন আগে,
লভিয়াছি স্নেহরাজি, ভরেছি হৃদয়-সাজি,
তব পুণ্য-সুরভিত আশীষ-পরাগ!

তখন জানিনে হায়; আর না বন্দিব পায়,
আর না ভুঞ্জিব ওই স্নেহ-সুধা রাশি,
দেবদর্শনের সম, ও মূর্ত্তি পবিত্রতম,
আর না হেরিব আহা হয়ে অভিলাষী!

শান্ত তপোধন মত, শ্রীমুখেতে অবিরত,
শুনিব না তত্ত্ব-কথা অমৃত-আধার,
উপদেশ মনোহর, শুভ্র যূথিকার থর,
শোভিবে না আর কভু মরমভাণ্ডার।

খেতোৎপল সম ধীরে, হৃদয়সরসীনীরে,
স্মৃতির কমলদল পবিত্র রুচির;
শত ব্যবধান টুটি, মানস-মৃণাল ফুটি,
সাধিছে সংযোগ যেন স্বর্গ-ধরণীর।

পাপ মর্ত্ত্য-ধামে থাকি, যেন দেব! সদা রাখি
ও আদর্শ-স্বর্গপানে দুটী আঁখিতারা;
কর দেব! আশীর্ব্বাদ, লভি বিভু-পরসাদ,
তাঁরি(ই) ভাবে হয়ে থাকি পূর্ণ আত্মহারা।

সেথা হতে অবিরত, আহা হেথাকার মত
ঢালিও হৃদয়ভরা মঙ্গলকামনা,
তুমি ত হও নি নয়, কিন্তু আর(ও জ্যোতির্ম্ময়,
তবে কেন অশ্রুধারা বিষাদ বেদনা!

ত্যজিয়া প্রবাস তুমি শোভিয়াছ মাতৃভূমি;
অনন্ত-চরণ চুমি আনন্দ-বিহ্বল,
ভুলেছ আপন কথা, ভুলেছ ধরার ব্যথা
উথলিছে পুণ্য, শান্তি, প্রেম অবিরল।

তুচ্ছ দেহ রাখি ভবে, যাও দেব! যাও তবে;
সমুজ্জ্বল কর গিয়ে স্বর্গ-তপোবন,
চরিত্র-সুষমা শশী, ঢালিবে কিরণ,
অনুদিন আলো করি মানস-কানন।

শোকার্ত্তা
ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

নিবেদন।

(১)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
আমিতো অজ্ঞান অতি,
জানি না ভকতি-স্তুতি
জ্ঞান, ভক্তি, শুদ্ধমতি—দাও হে আমায়।
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

(২)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
তোমার রহস্য-লীলা,
জগতের গূঢ় খেলা,
বুঝিতে যাচে না তব অজ্ঞান তনয়।
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

(৩)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
এ রহস্য-সৃষ্টি-মাঝে,
তোমার তনয় যাচে,
হিংসা, দ্বেষ, কভু যেন স্পর্শে না আমায়,
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

(৪)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
নিভৃতে হৃদয়-মাঝে
যত ভোগ তৃষ্ণা আছে,
চিরতরে দাও দূরে করিয়া বিদায়।
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

(৫)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
উচ্চ কথা, কটু কথা
কাহাকে না দেই ব্যথা
সবারে তুষিতে যেন এ জনম যায়।
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

(৬)

আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।
এ মিনতি করি আমি,
ওহে বিভু বিশ্বস্বামী,
তোমার চরণে যেন সদা মতি রয়।
আমার বাসনা প্রভো! নিবেদি তোমায়।

শ্রীমতী হেমকুসুম রায়,
ময়মনসিংহ।

কুন্দনন্দিনী।

(বঙ্কিমচন্দ্রের)

মরণের কোলে আজি পেয়েছি তোমায়,
জীবন-প্রভাতে যেই তরুণ তপন
ডুবে গিয়েছিল, আজি সন্ধ্যা জ্যোছনায়,
আবার হাসিল ওই বিকাশি কিরণ।

এ গভীর অন্ধকারে, বিস্তীর্ণ অপার
জগতের আলোরাশি গিয়াছে নিভিয়া,
এতগো আঁধার নয় আলোক আমার
এ আঁধারে কি আলোক উঠিল ফুটিয়া!

এ যে গো আশার চির বসন্তের রাতি,
গাছে গাছে ফুটিয়াছে চাঁপা ও বকুল,
প্রেমের তটিনী আজি ভরেছে দুকূল
এ মৃত্যু মরণ নয় জীবন আমার,
চির তৃষা মিটি গেল পরশে যাহার॥

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী,
এলাহাবাদ।

অঞ্জলি।

(স্বনামপ্রখ্যাত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সি, আই, ই, উপাধি-প্রাপ্তি উপলক্ষে রচিত।)

১

মঙ্গল-শঙ্খের ধ্বনি মুখরিত বঙ্গের ভবনে,
কি শুভ বারতা আসি প্রবেশিল বধির শ্রবণে,
আনন্দে আপনা-হারা পুলকিত আকুল পরাণ,
সমীর বহিছে মাতি গাহি নব বিজয়ের গান।

কুসুমে কুসুমে ভ্রমি অলিকুল করিছে
ঝঙ্কার,
হাসে ফুল হাসে লতা, হাসিরাশি আননে
সবার।
নিবিড় আঁধার ভেদি বঙ্গভূমি করি
আলোকিত,
ও কে গো সবিতা নব বঙ্গাকাশে হইল
উদিত।
কি অপূর্ব্ব প্রভা তাঁর তরুণ-অরুণ-ভাতি-
সম,
উছলিছে দিকে দিকে বিনাশিয়া সুগভীর
তম।
কর্ম্মক্ষেত্রে মহাকৃতি আদর্শ মানব বিশ্বতলে,
সৌভাগ্যের প্রিয় সুত অতুলন বঙ্গের
মণ্ডলে।

২

আজিকে নবীন প্রাতে ঝলমলি গৌরব-
ভূষণে,
বঙ্গের ভূষণ সম বিরাজিলে ভারত-গগনে!
হরষে হৃদয় ভোর ভক্তিভরে সজল
নয়নে।
ফুলকুল দূর্ব্বাকুল উপহার অর্পিছে চরণে।
চন্দ্রমা ঢালিছে সুধা, কোকিল মঙ্গল-গান
গায়,
বসন্তের নব রবি শুভাশিষ ঢালিছে মাথায়।
উজ্জ্বল শীরষ তব মহিমার গৌরব-ভূষণে,
প্রখর-আদিত্য-সম বিরাজিছ বঙ্গের
গগনে।
সুধন্য জগতীতলে বঙ্গের গৌরব
জ্যোতির্ম্ময়,
"স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ" মহাবাক্য সার্থক
তোমায়!
প্লাবিয়া বঙ্গের হৃদি জয়ধ্বনি উঠিছে অপার,
ধর দেব! অর্ঘ্যপুষ্প তনয়ার ভক্তি-উপহার।

শ্রীনিসদা দেবী,
এলাহাবাদ।

স্মৃতি।

নিশীথের স্বপ্ন সম মনে হয় মোর,
মাঝে মাঝে এখনও সেই মুখখানি,
বহু দূরাগত স্নিগ্ধ সঙ্গীতের মত
এখনো শ্রবণে বাজে সেই আধ বাণী।

সত্যই কি ছিলি তুই? অথবা স্বপন
ভ্রান্ত মন কাটাইতে পারে না যে হায়
এ প্রশ্নের কুহেলিকা—সত্যই কি তুই
একদিন প্রাণাধিক ছিলি এ ধরায়।

ছিলি যদি সত্য, তবে কেন নাই আজ
তোর স্মৃতি সুখময় কেন উঠে প্রাণে?
পরাণে জাগায়ে দেয় দারুণ বেদনা
বুক-ফাটা অশ্রুবিন্দু ঝরে দুনয়নে।

কেন এসেছিলি তুই ছায়াটীর মত
হৃদয়ে আঁকিতে শুধু মসীময়ী রেখা,
আজীবন আমাদের দগ্ধ করিবারে
দু দণ্ডের তরে কিরে দিয়েছিলি দেখা?

কখনো ছিলি না তুই প্রিয় সহোদর
সেই ভাল, স্বপ্নে আমি দেখেছিনু তোরে,
এই চিন্তা সুখময় ছিলি নারে তুই
স্বপ্নে শুধু দেখেছিনু দু'দণ্ডের তরে।

হায়রে সংসার! এর কিছু দিন আগে
যে নাকি ছিল গো মোর বুক ভরা ধন,
তারে আজি স্বপ্ন বলে ভুলিবারে চাই,
অনুপম! তোর স্মৃতি স্বপন! স্বপন!

সুরুচিবালা সেন।

চৈতককা চাবুত্রা *

(১)

কত যুগ, কত দিন
কালগর্ভে হল লীন,
এ পাপ পৃথিবী ত্যজি গিয়াছে চৈতক;
নশ্বর জগতে আর,
কোন চিহ্ন নাহি তার,
কীর্ত্তি শুধু অস্তিত্বের সে পরিচায়ক।

মৃত্যু এ বিশ্বের ধারা;
কিন্তু কীর্ত্তি রাখি যারা—
যায় ধরা হতে, তারা মরেও অমর।
চৈতকের সে অনন্ত
কীর্ত্তি তারে এ পর্য্যন্ত,
রেখেছে জীবিত করি ভুবন ভিতর।

(২)

হলদীঘাটের রণে,
খোরাসানি সৈন্যগণে,
হল যবে প্রতাপের পশ্চাতে ধাবিত;
প্রভুর রক্ষার তরে,
তখন সে দৃঢ়ভরে,
অক্লান্ত অশ্রান্ত বেগে ছুটিল ত্বরিত।

আপন দেহে যে তার
ঝরিছে রুধিরধার,
যেন সে বর্ষার ধারা অজস্র বর্ষণ!
নাহি দৃষ্টি নিজপানে
লক্ষ্য নাই কোন স্থানে,
করিল উলম্ফে গিরি-নির্ঝর লঙ্ঘন।

(৩)

প্রভু প্রাণ মান যবে
রক্ষা হল দেখি তবে
ক্লান্ত ক্লিষ্ট জীবনের হল অবসান;
প্রভুপদে লুটাইয়ে,
নীরব বিদায় নিয়ে,
চিরতরে হল ছুটি স্তিমিত নয়ন।

নরেও পারে না যাহা,
সাধিয়াছে অশ্ব তাহা,
বিশাল জগতীতলে ব্যাপ্ত তাই নাম;
কীর্ত্তি তার বুকে ধরে
শিক্ষা দিতে আছে নরে,
চৈতক চাবুত্রা ওই পুণ্য তীর্থধাম।

শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী মিত্র।

---

* প্রতাপসিংহের অশ্বচৈতক যে স্থানে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করে, সেই স্থানে তাহার স্মরণার্থ যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার নাম 'চৈতককা চাবুত্রা'।

ব্যথিতা।

(১)
সংসারের প্রতি কক্ষ
করি কত বিচরণ
ফিরে এনু লয়ে এবে
শ্রান্ত তাপিত মন।

(২)
পুষেছিনু হিয়া মাঝে
শুধু শ্রান্তিময়ী আশা
মরমে লুকান র'ল
অস্ফুরন্ত ভালবাসা।

(৩)
সাধিলাম কোন্ কাজ
এসেছিনু কোন্ কাজে,
নগণ্য জীবন লয়ে
পড়েছিআছি বিশ্বমাঝে।

(৪)
জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে
কর্ত্তব্যে করিয়া ভুল,
ফিরিয়াছি অন্ধ আমি
অকৃতজ্ঞ সমতুল।

* * * *

(৫)
চির উপোষিত প্রাণে
এসো ওগো হৃদয়েশ!
কাটায়েছি দীর্ঘ দিন
কত দীর্ঘ বর্ষ শেষ।

(৬)
অসহ্য যাতনা সহে!
বহিতে পারি না আর;
দাও চির আলিঙ্গন
মুছে ফেল অশ্রুধার!

(৭)
উন্মত্ত হৃদয়ে মম
উঠিতেছে শত ঢেউ,
নিঃসঙ্গ জীবন-পথে
সঙ্গী ত হল না কেউ।

(৮)
এস গো জন্মান্ত মৃত্যু!
চির সহকার হয়ে—
বশো এ তাপিত প্রাণ
জুড়াক তোমারে পেয়ে।

(৯)
তুমি সাথী হবে মম
শান্তি-সহকার বেশে,
তাপিত এ হিয়াটুকু
নিয়ে যাবে দূর দেশে।

(১০)
অণু পরমাণু রূপে
মিশিব তোমারি সনে,
ভুলিব যাতনা জ্বালা
তব স্নিগ্ধ পরশনে!

(১১)
তাই আসিয়াছি লয়ে
তুচ্ছ পরিত্যক্ত মন,
ওগো মৃত্যু! আজি মোরে
দাও চির আলিঙ্গন।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়,
মাণিকগঞ্জ, ঢাকা।

ধীরে।

প্রভাকর কর দগ্ধ
জুড়াইয়া ধরণীরে,
মধুর দখিণা বায়
বয়ে গেল ধীরে ধীরে।

ধীরে ধীরে ডুবে গেল
দ্বিতীয়ার শিশু শশী,
ধীরে ধীরে নীলাকাশে
তারকা উঠিল হাসি।

বন উপবন ভ'রে
যূথিকা গোলাপ বেলা
ফুটিতে লাগিল ধীরে
যতেক কুসুমবালা।

বসিয়া আপন নীড়ে
মধুরে তুলিয়া তান,
গাহিল বিহঙ্গগণ
ধীরে সুললিত গান।

তারকা-কিরণ পরি
অলস অবশ প্রাণে
ধীরে নদী বয়ে গেল
সাগরের দরশনে।

কচি হাতে ডেকে ডেকে
আয় চাঁদ আয় ব'লে,
ধীরে ধীরে মার কোলে
ঘুমাইল শিশু ছেলে।

ধীরে সুষুপ্তিতে মগ্ন
হ'ল ধরা-কোলাহল,
আরও উজ্জ্বল হ'ল
উজ্জ্বল তারকাদল।

ধীরে ধীরে সে তারাও
উষারে আগত দেখে,
ক্ষুণ্ণ নীলিমের বুকে
লুকাল মনের দুখে।

ধীরে দেবমন্দিরের
পূজারি উঠিয়া এল,
মঙ্গল আরতিধ্বনি
ধীরে ধীরে শোনা গেল।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী।

শিশু।

আয় বুকে ওরে শিশু!
সুধা হাসি নিয়ে,
টলি' টলি', পড়ি' পড়ি',
দিক্ উজলিয়ে।

স্বরগের, সোহাগের,
ফুলের কলিটি তু'ই,
সুবাসে মাতালি প্রাণ,
ওরে ওরে ক্ষুদ্র যুঁই!

কি মধু অমৃতমাখা
কচি ও অধরপাতে ;
পরাণ ভরিয়ে যায়
চুমাটি অর্পিয়ে যাতে।

তোরে হেরি মনে হয়
প্রেমেভরা এ সংসার,
এ বিশ্বের মাঝে তুই
শ্রেষ্ঠ কবিতার সার।

হৃদয়ে ধরিয়া সুখে
ওই ক্ষুদ্র দেহখানি
কি সুধা-সাগরে ভাসি,
প্রকাশিতে নাহি জানি।

আয় কোলে ওরে শিশু !
সুধাভরা হাসি নিয়ে,
টলি' টলি' পড়ি' পড়ি,
চারি দিক উজলিয়ে।

আয়রে তাপিত কোলে
প্রাণাধিক প্রিয়ধন !
শান্তির আধার তুই,
সুখী কর প্রাণ মন।

শ্রীমতী স্নেহশীলা চৌধুরাণী।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

দন্তরোগ।

১। বালকদের দাঁতে পোকা ধরিলে পুকুরের বড় পানার শিকড় ২।৩ দিন চিবাইতে দিলে দাঁতের পোকা ও ব্যথা নিবারিত হয়।

২। সর্ষপতৈলে কিঞ্চিৎ হিঙ্ মিশ্রিত করিয়া গরম করিয়া লইবে, পরে ঐ তৈল দাঁতের পোকায় এবং দন্তশূলরোগে একটী তুলি দ্বারা রোগস্থানে লাগাইলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল নিবারিত হয়।

৩। আমের পাতা দ্বারা দাঁতন করিলে চলিত দন্তও দৃঢ় হয় এবং বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত দন্ত সুদৃঢ় থাকে। দন্তরোগের জন্য কখনও কোন কষ্ট হয় না।

৪। লবণ ও দারুচিনি সমান ওজনে বাটিয়া দন্তশূলস্থানে লাগাইয়া রাখিলে দন্তশূল আরোগ্য হয়।

৫। তামার পাত্রে এরণ্ডের আঠা গরম করিয়া দন্তের ফুলা ও ব্যথাস্থানে লাগাইলে ফুলা ও ব্যথা দূরীভূত হয়।

৬। হিজলের মূল বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তের মূলদেশে রাখিলে চলিত দন্তও দৃঢ় হয়।

পুস্তকসমালোচনা।

বনফুল।—শ্রীমতী প্রতিভাসুন্দরী দেবী-প্রণীত নানাবিষয়িণী কবিতামালা।—শ্রীনয়নচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত,—এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রাঙ্কনাদি সুন্দর। দেবপূজার পুষ্পপাত্র এইরূপ সুন্দর হওয়াই উচিত। গ্রন্থে মূল্যের উল্লেখ নাই, ভালই হইয়াছে. কেননা, গ্রন্থখানি অমূল্য। প্রতিভাসুন্দরী ১৩ বৎসরের বালিকা, ইহা বালিকার প্রথম উদ্যমের ফল।

"তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে"

প্রতিভার আবার বাল্য যৌবন কি? অগ্নিস্ফুলিঙ্গও অগ্নি। গ্রন্থখানি নীরবে পড়িয়াছি, অন্যকেও পড়িতে অনুরোধ করি। স্বদেশের ও মাতৃভাষার প্রভূত কল্যাণের জন্য এ প্রতিভার পূর্ণ-বিকাশ মঙ্গলময়ের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

বামাবোধিনী সম্বন্ধে সংবাদপত্রের মন্তব্য।

"বামাবোধিনী ফাল্গুনের সংখ্যা। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত 'ভক্তকবি তুলসী দাস' অতি মনোরম হইতেছে। তুলসীদাস ভক্তি-সঙ্গীতরচনায় ও গানে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কবিরত্ন মহাশয় এই সংখ্যায় তাহাই আলোচনা করিয়াছেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গীতের অলৌকিক প্রভাব ও মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর "দ্বারকানাথ মিত্র" ক্রমশঃ প্রকাশ্য রচনা * * * প্রমাণ-পল্লীনামধেয় রচনায় শিক্ষণীয় কথা যথেষ্ট আছে * * * এবারে ইহাতে বসন্ত-রোগের অনেকগুলি পাচন ও মুষ্টিযোগ সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা সর্ব্বসাধারণের পড়া উচিত * * "—সময়, ১৬ই এপ্রেল, ১৯০৯।

"The Bamabodhini Patrika that stands as the best monument to the labours of the late Umesh Chandra Dutt on behalf of our womankind, has a glorious record in this respect, having exercised a beneficent influence on our ladies for more than three decades." The Indian Mirror—21st April, 1909.

২।১৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 552. August, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫২ সংখ্যা। { শ্রাবণ, ১৩১৬। অগষ্ট, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

সম্মিলন—সম্মিলন কথাটী অতি মধুর। একপ্রাণতা হইতে সম্মিলন সম্ভূত। একতায় অসাধ্য সাধিত হয়। "তৃণৈঃ গুণত্বমাপন্নৈর্ব্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ"। পূর্ব্বে এদেশে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের যেরূপ দ্বেষ-হিংসার প্রাবল্য ছিল, অধুনা বহুল পরিমাণে তাহার হ্রাস লক্ষিত হইতেছে। এক্ষণে পরস্পরের হিতচেষ্টায় দেশের মঙ্গলকর কার্য্যে ভারতবাসীদিগের সম্মিলন ও একতা দর্শনে আমাদের হৃদয়ে অপরিসীম আনন্দের উদয় হইতেছে।

ধর্ম্ম-সম্মিলন—অল্প দিন হইল,টাউন-হলে মহাধর্ম্মসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় ভারতের সকল সম্প্রদায়েরই নেতৃগণ উপস্থিত হইয়া একতার পরিচয় দিয়াছেন।

চিকিৎসা-সম্মিলন——বোম্বাইয়ে চিকিৎসকদিগের এক মহাসম্মিলন হইয়া গিয়াছে। এ সভায় কৃতবিদ্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ একত্র সম্মিলিত হইয়াছিলেন।

বণিক্‌সম্মিলন–বেঙ্গালোরের বণিক্‌সম্প্রদায়ের উদ্‌যোগে সম্প্রতি একটি বণিক্‌-সম্মিলনের আয়োজন হইতেছে। ভারতের ও ব্রহ্মদেশের বাণিজ্যপ্রধান বন্দর ও নগর সমূহের সমস্ত খ্যাতনামা বণিক্‌সম্প্রদায়ই এই সম্মিলনে যোগ দান করিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই সভায় শুধু ভারতবাসীর সম্মিলন হইবে না, ইহাতে জাতিনির্ব্বিশেষে বাঙ্গালার ইংরাজ আদি সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া বাণিজ্যের বিস্তার ও উন্নতি সম্বন্ধে আপন আপন মতামত প্রকাশ করিবেন। দেশীয় বণিক্‌গণ সভাস্থলে আত্মবিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য হইতে যেন বিচ্যুত না হন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

সম্পাদক-সম্মিলন—বিলাতে ইম্পিরিয়াল্ প্রেস্ কন্‌ফারেন্স অর্থাৎ সম্পাদক-সম্মিলনীতে নানা দেশের মুখপত্রসমূহের প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন। এই সভায় আমাদের দেশপূজ্য বাগ্মিবর শ্রীযুক্ত

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের প্রতিনিধি স্বরূপ উপস্থিত থাকিয়া বিলাতের রাজপুরুষদিগের ভারতবাসিসম্বন্ধে অযথা ভুল সংস্কারগুলি দূরীকরণার্থ সভাস্থলে সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। মানচেষ্টারে এক মহতী সভায় সুরেন্দ্র বাবু একটী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। সভায় উপস্থিত সকলেই একবাক্যে সুরেন্দ্র বাবুর বাগ্মিতা ও ন্যায়পরতার প্রশংসা করিয়াছেন। বিলাতের টাইম্‌স্ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহ সুরেন্দ্র বাবুর সুমধুর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতার গুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। মানচেষ্টারের বণিক্‌সভার সভাপতি নিজ বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলন সফল হইয়াছে, এবং মানচেষ্টারের বণিক্‌সম্প্রদায় বঙ্গের স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষ নহেন"। কানাডার প্রতিনিধিগণ মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শ্রুতিমধুর ও নীতিগর্ভ। সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা ভাষা-মাধুর্য্যে ও রাজনৈতিক যুক্তিপ্রয়োগে অসাধারণ, ইহা বিলাতের প্রধান প্রধান সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছেন এবং বিলাতে মানচেষ্টারে সভাস্থলে উপস্থিত নানা স্থলের প্রতিনিধিগণও স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেস-কন্‌ফারেন্সের প্রথম অধিবেশন হইয়া গেলে সুরেন্দ্র বাবু পার্লামেণ্টের কমন্সসভায় গমন করেন এবং তথায় লর্ড কর্জ্জনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লর্ড কর্জ্জন সাদরে সুরেন্দ্র বাবুর করমর্দ্দন করেন এবং কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত আলাপ করেন। তৎপরে সুরেন্দ্র বাবু পার্লামেণ্টের সদস্য মিঃ হিটনের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনে গমন করেন। তথায় জাপানের রাজকুমার ও রাজপুত্রবধূর সহিত তাঁহার আলাপ হয়। তদনন্তর আমাদের সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় সাদরে সুরেন্দ্র বাবুর কর মর্দ্দন করেন এবং হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত আলাপ করেন। এই স্থানে জলযোগ করিয়া সুরেন্দ্র বাবু দীর্ঘকাল ধরিয়া একজন বিচক্ষণ এবং ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ রাজমন্ত্রীর সহিত আলাপ করেন। অনেক বিষয়েই তিনি সুরেন্দ্র বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। প্রেস কন্‌ফারেন্সে সমাগত প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে সুরেন্দ্র বাবু সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, ইংলণ্ডবাসিগণ উহা স্বীকার করিয়াছেন।

বিলাতে সর্ব্বত্রই সুরেন্দ্র বাবু সাদরে ও সসম্মানে গৃহীত হইয়াছেন। মানচেষ্টার নগরের রেল ষ্টেসন প্লাটফরমে তত্রত্য গণ্য মান্য নাগরিকগণ পুষ্পমাল্যে সুরেন্দ্র বাবুকে বিভূষিত করেন, এবং পুষ্পাঞ্জলি দিয়া তাঁহার সংবর্দ্ধনা করেন।

দেশহিতৈষী সুরেন্দ্র বাবু ত্বরায় স্বদেশে প্রত্যাগত হইবেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভগবানের নিকট তাঁহার নিরাপদ প্রত্যাগমন ও দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

ভক্তকবি তুলসীদাস।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

ছিন্নমূল তরুর ন্যায় দস্যুপতিকে নিজ পদতলে নিপতিত দেখিয়া, তুলসী তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন, এবং তাহাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। সেই আলিঙ্গনের সহিত তাঁহার আত্মার পতিতপাবনী শক্তি অব্যক্তভাবে দস্যুপতির আত্মায় সংক্রামিত হইল। শুষ্কপ্রায় হ্রদের মৃতকল্প মীন যেমন নববারিসেকে স্পন্দিত হয়, তেমনি তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও কণ্টকিত হইয়া উঠিল। আর সে কথা কহিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠরোধ হইল, নয়ন বাষ্পভারাক্রান্ত হইল। সে জানু পাতিয়া করযোড়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ ভাবে রহিল।

পদতলে নিপতিত, দীনহীন অনাথের ন্যায় রোরুদ্যমান, অনুতপ্ত পাপীকে দেখিয়া তুলসীর হৃদয় দয়ারসে দ্রবীভূত হইল। তিনি তাহাকে ক্রোড়ে বসাইয়া, অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন,—বৎস! পাপ করিয়াছ, ভয় কি? যাঁহার কৃপায় আজি তোমার প্রাণে অনুতাপের উদয় হইল, তিনি পতিতপাবন, তিনি স্পর্শমণি, তিনি চিন্তামণি, তিনি অন্ধের নয়ন, অনাথের নাথ, দীনের বন্ধু, পাপী তাপীর স্নেহময়ী মা!

বৎস! হতাশ হইও না। যতই মহাপাপ করিয়া থাক, সেই দয়াময় হরি তোমার সমস্ত পাপতাপ ক্ষালন করিবেন। তুমি একান্তভাবে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ কর। তোমার পাপের পরিমাণ যতই অধিক হউক, তাঁহার দয়া ও ক্ষমার তুলনায় তাহা কিছুই নয়। অনন্ত কোটি জীবের অনন্তকালসঞ্চিত পাপরাশিও সেই দীনবন্ধুর একবিন্দু দয়াগুণের তুলনায়, মহাসিন্ধুর নিকট বিন্দুর ন্যায় নগণ্য। তাঁহার বিন্দুমাত্র কৃপারসে শত শত মহাগিরির ন্যায় সমুচ্চিত পাপরাশি ভাসিয়া যায়। ধনী দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ, পণ্ডিত, মূর্খ, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাপী, পুণ্যবান্‌ সকলেই তাঁহার সমান স্নেহাস্পদ। তিনি সমদর্শী। ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া গাহিলেন;—

"হামারে প্রভু! অগুণে চিতে না ধরো,
সমদর্শী প্রভুনাম তোঁহারা, সোহী পার করো।

এক লোহা পূজমে রহতে, এক ঘরে বধকো পরো।

সো দুবিধা পরেশ না জানে, কাঞ্চন হোতে খরো।

এক নদী, এক নালে কহোয়ত ময়লো বহে নীরো।

সব বহে মেলে একবরণ হোয়, গঙ্গানাম পরো" ।(১)

(১) এই গানটী যথাশ্রুত লিপিলাম। ইহার স্থানে স্থানে প্রকৃত মূল ভজনটীর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিতে পারে।

অর্থাৎ হে প্রভো জগদীশ! আমি নিগুর্ণ বলিয়া কি তোমার চিত্তে স্থান পাইব না? প্রভো! তোমার নাম 'সমদর্শী,' কেননা, সগুণে-নির্গুণে, পাপী-পুণ্যবানে তোমার সমান স্নেহ। অতএব আমাকে পার কর। দেখ! যে লৌহ দেবপূজায় ব্যবহৃত হয়, (১) এবং যে লৌহ কষাই ব্যক্তির হস্তে (শস্ত্ররূপে) জীবহিংসায় ব্যবহৃত হয়, পবিত্রচন্দনাক্ত ও দূষিতশোণিতাক্ত সে উভয় লৌহই স্পর্শমণির স্পর্শলাভ করিয়া সমভাবে; বিশুদ্ধ কাঞ্চনে পরিণত হয়। স্পর্শমণি এ উভয় লৌহে ভেদ জানে না। দেখ! জল যখন ময়লা নর্দ্দমায় গিয়া পড়ে, তখন তাহা নরকতুল্য অস্পৃশ্য হয়, কিন্তু সেই বিকৃত জল গঙ্গায় গিয়া মিলিত হইলে, বিশুদ্ধ গঙ্গাজলে পরিণত হয়, তখন আর গঙ্গাজলে ও সে জলে কোনও ভেদ থাকে না। সেই গঙ্গামিলনপূত জল তখন অবাধে স্নান-পান-দেবপূজাদি কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব হে বৎস! তুমি মহাপাপী হইলেও, নৈরাশ্যের কারণ নাই। তুমি সেই পতিতপাবন নারায়ণের চরণে সম্পূর্ণভাবে আত্মাকে সমর্পণ কর, সাধুসঙ্গ ক্ষণমাত্রও পরিত্যাগ করিও না, তোমার সমস্ত পাপ-তাপ, মলিনতা এবং সুতীব্র অনুতাপ তুষানলের জ্বালা অচিরেই বিলীন হইবে। সেই চিন্তামণির স্পর্শে তুমি অপূর্ব্ব শান্তিময় নবজীবন লাভ করিবে। জীবের আত্মা পাপপঙ্কে যতই কলুষিত হউক, সেই পতিতপাবনে মিলিত হইবামাত্র ধৃতপাপ হইয়া যায়। ঘোর দস্যু রত্নাকর প্রভৃতি ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। তুমি যে হস্তে শত শত নরহত্যা করিয়াছ, তোমার সেই নরশোণিতদূষিত হস্তকে নরলোকের মহা-কল্যাণে নিযুক্ত কর। তোমার যে হস্ত কত শত পরিবারকে অনাথ করিয়াছে, তাহাদের শোকাশ্রুধারায় ধরাকে অভিষিক্ত করিয়াছে, আজি হইতে তোমার সেই হস্ত দীনহীন, অনাথ অনাথাগণের শোকাশ্রুমার্জ্জনে নিযুক্ত হউক। আজি হইতে তুমি বিপন্নগণের অভয়দাতা হও; অনাথ-অনাথার আশ্রয় হও; তাপিতের প্রাণে শান্তিসুধা বর্ষণ কর। মানব যতই মহাপাপী হউক, তাহার শাশ্বত শান্তি-লাভের ইহাই অমোঘ ও আশুফলপ্রদ উপায়।

বৎস! হতাশ হইও না। এই উপ-দেশ গ্রহণ করিলে, তোমার এ নিদারুণ মর্ম্মব্যথা প্রেমানন্দে, এবং তোমার এ শোকাশ্রুধারা আনন্দাশ্রুধারায় পরিণত হইবে। তোমার পাপোপার্জ্জিত সমস্ত অর্থ, বসনভূষণাদি সমস্তই অকৈতবে দীনসেবায় নিযুক্ত কর। সেই জগন্নাথের জগন্মঙ্গল নামমন্ত্রকেই তোমার জীবনের একমাত্র সম্বল কর। সেই হৃদয়েশ্বরকে তোমার হৃদয়পীঠে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অহরহঃ বিশ্বপ্রেমের সাধনায় মন প্রাণ-

(১) দেবপূজার উপকরণে অষ্টধাতু ব্যবহৃত হয়; তন্মধ্যে লৌহ ধাতু প্রধান। লৌহ পবিত্র বলিকার্য্যে এবং দেবমূর্ত্তিগঠনেও ব্যবহৃত হয়।

আত্মা ও ইন্দ্রিয়গণকে নিমগ্ন কর। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি হইয়া অদ্বৈত ভক্তিযোগে ভূতকল্যাণসাধনাই সেই দেবাধিদেবের মহাপূজা; তিনি ভক্ত সেবকের সর্ব্বদুঃখ-হারী। তিনি ভক্তহৃদয়ে অনুক্ষণ নব-নব-নব নিরুপম প্রেমানন্দের উৎসকে উন্মুক্ত করিয়া দেন। যেমন অকৃতী, অধম বা পীড়িত সন্তানের উপর জননীর স্নেহ অধিক, তেমনি পাপতাপে দহ্যমান, অনুতপ্ত শরণাগতের উপর সেই দীন-বন্ধুর দয়া অধিক। ইহা বলিতে বলিতে দয়ার্দ্রহৃদয় তুলসীদাস প্রেমনির্ভরে ও প্রেমাশ্রুসিক্তনয়নে সেই দস্যুপতিকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। কি এক অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে দস্যুরাজ বিহ্বল ও বিচেতন হইয়া, তুলসীর পদতলে পতিত হইল। তাহার বক্ষোবাহিনী অশ্রুধারায় তুলসীর পদতল সিক্ত হইল। শুষ্ক অরণ্যানীর এক প্রান্তে অগ্নি লাগিলে, সেই অগ্নি দেখিতে দেখিতে যেমন সমস্ত অরণ্যে সঞ্চারিত হয়, তেমনি নিজ দল-পতির দৃষ্টান্তে সমস্ত দস্যুদল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হইল, এবং অস্ত্রশস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া, তৎক্ষণাৎ করযোড়ে তথায় নিপতিত হইল। তখন সকলেই স্তব্ধ ও নিঃশব্দ, কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া সকলেই অশ্রু-মোচন করিতে লাগিল। জ্ঞান হইল যেন, একটী বিশাল অরণ্যানী বায়ুবিরহে নিস্পন্দ হইয়া আছে এবং তাহার পত্রে পত্রে শিশির ঝরিতেছে!

অনন্তর সদলে দস্যুরাজ আগ্রহ সহ-কারে ভগবান্ তুলসীর নিকট তারকব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, গুরুদেবের আদেশে দীনসেবায় নিযুক্ত হইল। কথিত আছে, তাহারা দস্যুতায় যে শক্তি প্রকাশ করিত, লোককল্যাণে তাহার সহস্রগুণ শক্তি প্রকাশ করিয়াছিল।

অঘটনঘটনাপটীয়সী ঐশী শক্তির গূঢ় তত্ত্ব মূঢ় মানব কি বুঝিবে? সেই করুণা-ময়ের ইচ্ছায় এ সংসারে কখন কোন্ ঘটনা কি উদ্দেশ্যে ঘটিতেছে, তাহা প্রগাঢ়-ধী-শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানিগণেরও বুদ্ধির অগম্য। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁহাতে মঙ্গল ভিন্ন আর কিছুই থাকিতে পারে না। এ সংসারে রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন, ব্যসন, জরা, মৃত্যু, সকলি তাহার মঙ্গল-হস্তের চিহ্ন। দেখ! যাহাকে সকলে সাক্ষাৎ কালসর্প ভাবিয়া দূরে পলায়ন করিত, সেই ভয়াবহ দস্যুদল দয়াময়ের ইচ্ছায় বিশ্ববন্ধুরূপে সকলের হৃদয়াসন অধিকার করিল।

এ প্রসঙ্গে এ স্থলে আর একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। বোধ হয় ঘটনাটী অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমার ৺পিতৃদেব বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কথক ছিলেন (১)। তিনি একদা কাল-

(১) ৺পিতৃদেবের আধ্যাত্মিক প্রভাব, জ্ঞান, স্মৃতিশক্তি, দয়া ও অমায়িকতাদি গুণাবলী বর্ণনাতীত। স্বতন্ত্র পুস্তকে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। এজন্য এস্থলে উল্লিখিত হইল না।

নায় কয়েক মাস কথকতার পরে, নৌকা-যোগে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গে বিস্তর টাকা ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি ছিল। তাঁহার কনিষ্ঠ মধ্যম সহোদর তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা কালনা হইতে প্রাতে যাত্রা করেন। ক্রমে অপরাহ্ণ আসিল। সে সময় দেখিলেন, একখানি অপূর্ব্ব নৌকা তীরবেগে তাঁহাদের নিকট দিয়া চলিয়া গেল। সেই নৌকার গঠন ও গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তিনি একটু বিস্মিত ভাবে নৌকাবাহকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কাহার নৌকা? তাহারা উত্তর করিল না; কিন্তু তাহাদের বদনে ভীতির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। কিছুক্ষণ পরে সেই নৌকা পুনরায় তাঁহাদের সম্মুখীন হইল, এবং পূর্ব্ববৎ বেগে চলিয়া গেল। সেই নৌকার ঐরূপ গতিবিধি দেখিয়া, সকলেরি মনে আতঙ্ক হইল, কেননা, ঐ সকল স্থানে তৎকালে ভীষণ জলদস্যুর ভয়। বিশেষতঃ ঐ প্রদেশে তৎকালে রামবসু নামক প্রসিদ্ধ দস্যুপতির দুর্দ্দম প্রভাব।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। ভয়ের কারণ উপস্থিত ও সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, পিতৃদেব নাবিকগণকে কোনও নিরাপদ স্থানে নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। তাহারা এক স্থানে নৌকা বাঁধিয়া কার্য্যব্যপদেশে নৌকা ফেলিয়া পলায়ন করিল। ক্রমে ঘোর অন্ধকার, কোনও পদার্থ আর লক্ষিত হয় না। পিতৃদেব প্রমাদ গণিয়া, সোদরকে কোলে লইলেন, এবং মনে মনে সঙ্কটহারী মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। ক্রমে তদীয় আত্মার নিগূঢ় ভক্তি সঙ্গীতরাগে অভিব্যক্ত হইল। তিনি গাহিতে লাগিলেন,—

"বিপদে ডোবে কি তার তরী?
শর্ম্ম, বর্ম্ম, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, গতি, মুক্তি যার হরি।
রতি, মতি, ধৃতি, দণ্ড, ভাবগণ তার
দণ্ডধারী।
শ্রদ্ধা মাস্তুল, ভক্তি পাল, শ্রীহরি
কাণ্ডারী।"

উচ্ছলিত ভাবাবেশে তাঁহার নয়নযুগলে ধারা বহিতে লাগিল। নাড়ীচক্রের সহিত তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অমৃতধারায় প্লাবিত হইল। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া উপস্থিত সঙ্কটের কথা এককালে বিস্মৃত হইলেন। সে সময় কি অবস্থায় কোথায় আছেন, কিছুমাত্র উদ্বোধ নাই। গভীর রাত্রি, চরাচর নিস্তব্ধ। সেই সঙ্গীতের স্বরলহরী গঙ্গাবক্ষের কলকল নাদে মিলিত হইয়া, সেই প্রেমসিন্ধুর দিকে ছুটিয়াছে। তাঁহার মূর্ত্তিখানি শান্তিরসের আধার, সে সময় তাহা হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ নিষ্ঠ্যূত হইতেছিল। দীপালোকে সে মুখমণ্ডল দর্শন করিলে, দংশনোদ্যত ফণীকেও নিজ ফণামণ্ডল সঙ্কুচিত করিতে হয়। সেই সময় অকস্মাৎ তাঁহার সম্মুখে এক দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ আসিয়া দণ্ডায়মান। তাহার দেহ বীরোচিত সুলক্ষণে সমন্বিত, তাহার হস্তে উন্মুক্ত কৃপাণ। সেই পুরুষ আমার পিতৃদেবকে দেখিয়াই একটু সরিয়া দাঁড়াইল,

এবং কিয়ংক্ষণ স্তম্ভিতভাবে তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। অনন্তর পিতৃদেব অমৃত-মধুর বাক্যে কহিলেন,—তুমি যদি ধন-লোভে আসিয়া থাক, তবে তাহা গ্রহণ কর, কিন্তু আমাদিগকে প্রাণে মারিও না। এই পুণ্যসলিলা জাহ্নবীর বক্ষকে নিরপরাধ ব্রাহ্মণশোণিতে কলুষিত করিও না। এই লও, আমাদের সঙ্গে যাহা কিছু অর্থ ও দ্রব্যাদি আছে, সকলি গ্রহণ কর। এই বলিয়া তিনি টাকা ও অলঙ্কারাদি এবং নিজ অঙ্গ হইতে পরিধেয় পর্য্যন্ত উন্মোচনপূর্ব্বক তাহার সম্মুখে রাখিলেন। অনন্তর বাষ্পগদ্গদ স্বরে কহিলেন,—আমাদের বৃদ্ধ পিতামাতা তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় আকুলপ্রাণে আমাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাদের গমনে বিলম্ব ঘটিলে, তাঁহাদের জীবনসংশয় ঘটিবে। পিতা আরো কহিলেন,—যদি তুমি একান্তই প্রাণে মার, তবে আমার প্রাণ হরণ করিয়া, আমার এই প্রাণাধিক সহোদরের প্রাণ ভিক্ষা দাও।

দস্যুপতির মুখে আর কথাটী নাই। সে অনেকক্ষণ মৌনভাবে থাকিয়া শেষে কহিল,—আমি আপনার দ্রব্য স্পর্শ করিব না। আপনাদের একগাছি কেশেরও হিংসা করিব না। আমি পূর্ব্ব হইতেই গূঢ় চর দ্বারা আপনার বহু অর্থ লাভের সংবাদ জানিয়াছি, এবং আপনার গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রাখিয়াছি। যদি আপনি রক্ষক সঙ্গে আনিয়া আমাকে বাধা দিতেন, তবে এতক্ষণ নিশ্চয় সকলেই হত হইতেন। এক্ষণে কোনও অনির্ব্বচনীয় কারণে আমার মনের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। জানিনা বিধাতার কি ইচ্ছা! অনুগ্রহ করিয়া আমার একটী অনুরোধ রাখিতে হইবে, একদিনের জন্য আমার বাটীতে আপনাকে আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে। আমার বৃদ্ধা জননী আপনার আগমনে পরমানন্দ লাভ করিবেন। পিতৃদেব তাহার বাক্যে সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন,—চল! এখনি তোমার বাটীতে যাইতেছি। তুমি যখন অভয়দান করিলে, তখন তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই। অনন্তর দস্যুপতি তাঁহার নৌকা ও দ্রব্যাদি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া যানারোহণে তাঁহাদিগকে পরম যত্নে স্বগৃহে লইয়া গেল। পিতৃদেব তাহার এবং তাহার বৃদ্ধা জননীর ও পত্নীর ভক্তিপূর্ণ অমায়িক ব্যবহারে পুলকিত হইলেন। বিশেষতঃ সেই দস্যু পরিবারের অতিথিসেবার অসাধারণ অনুরাগ দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাহাদের ভবনে দরিদ্রসেবার জন্য দানভাণ্ডার নিয়তই উন্মুক্ত রহিয়াছে। একদিন তাঁহাদিগকে সে বাটীতে থাকিতে হইল। কেননা, তাঁহার কথকতা শুনিবার জন্য উক্ত পরিবার ও স্থানীয় লোকেরা নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। কথকতার অবসানে সপরিবার দস্যুপতি পিতৃদেবের চরণে রাশীকৃত স্বর্ণমুদ্রা ও নানা বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার প্রদান করিল। পরদিন প্রস্থান-কালে তাহারা নৌকা পর্য্যন্ত আসিয়া

তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। পথে আর কোনও বিপদ্ না ঘটে, এজন্য দস্যুপতি পিতৃদেবের সঙ্গে উপযুক্ত রক্ষক দিয়াছিল। তাঁহারা এইরূপ করুণাময় ঈশ্বরের আশ্চর্য্য কৃপাবলে সঙ্কটমুক্ত হইয়া নির্বিঘ্নে গৃহে আসিলেন।

(ক্রমশঃ)

আলমোড়া ভ্রমণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

তার পর একদিন আমরা পাতালদেবীতে পরমহংস বাবার সমাধি দেখিতে গেলাম। শুনিলাম, পরমহংস বাবা একজন বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার নাম ও সবিশেষ পরিচয় কেহই জানে না। এখানে তিনি পরমহংস বাবা বলিয়াই পরিচিত। তিনি প্রায় ২২।২৩ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের বাসা হইতে পাতালদেবী ৩ মাইলেরও অধিক পথ। আহারাদির পর বেলা ২টার সময় আমরা যাত্রা করিলাম, চারি দিকে পর্ব্বতমালা ও আলমোড়ার নানা দৃশ্য দেখিতে দেখিতে পাতালদেবী পৌঁছিলাম। এখানে একটি বহুদিনের পুরাতন দেবীমন্দির ও পাতালেশ্বর মহাদেব নামে একটি শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। আলমোড়া হইতে এ স্থানটি নীচ বলিয়া সম্ভবতঃ পাতালদেবী নাম হইয়াছে। পরমহংস বাবা এই স্থানে ১০ বৎসর বাস করিয়াছিলেন। এই স্থানেই দেহত্যাগ করিয়াছেন, পরে তাঁহার ভক্তগণ পাতালদেবী হইতে কিয়দ্দূরে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি শিবমন্দির প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছেন। পরমহংস বাবা সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি নানা ভাষায় নানা লোকের সহিত কথা কহিতেন। আলমোড়ায় বৃদ্ধগণের মধ্যে এখন তাঁহার ভক্তসংখ্যা অনেক। পরমহংস বাবার একজন ভক্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত জীবানন্দ তেওয়ারীর মুখে তাঁহার সাধনা ও বিচিত্র মহিমার অনেক গল্প শুনিয়াছি। পরমহংস বাবা তিন চারিটি পুত্র কন্যা ও স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশ হইতে হিমালয়ের এই নিভৃত স্থানে সাধনা করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের কোন্ স্থানে তাঁহার নিবাস, তাহা তিনি কাহাকেও বলেন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে একটি আশ্চর্য্য গল্প শুনিলাম, গল্পটি এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। বঙ্গদেশীয় একজন ধনী লোকের একমাত্র পুত্র সন্তান ছিল। ছেলেটী মূর্খ হওয়ায় যৌবনে বিস্তর অর্থ অপব্যয় করিতে লাগিল। পুত্রের অত্যাচার অসহ্য হওয়ায় একদিন পিতা বিস্তর তিরস্কার করিয়া ধিক্কার দিতে দিতে পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। তখন পুত্রের

মনে ঘৃণা জন্মিল, অনুতাপ হইল। তখন সে সাক্ষাৎ শিবসন্দর্শনকামনায় অন্নজল পরিত্যাগ করিয়া কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তার পর দৈববাণী হইল, "অন্নজল গ্রহণ কর, এবং আলমোড়ায় গিয়া পরমহংস বাবার শরণ লও।" তখন সে বহুকষ্টে, অনাহারে অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আলমোড়ায় আসিয়া পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে তাঁহার চরণে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গেল। তখন পরমহংস দেবের নিকট অনেক দর্শক ও ভক্তবৃন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁহারা ইহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পরমহংসদেব বলিলেন, "আরে! কে তুই? কেন এমন করিতেছিস্? কিন্তু সে তখন আর উত্তর দিতে পারিল না। তখন পরমহংসদেব নিকটস্থ একজন ভক্তকে বলিলেন, "হতভাগা বহুদিনের অনাহারী; ইহাকে এখান থেকে লইয়া যাও, ভাল করিয়া ডালরুটি খাওয়াও, গরম দুধ পান করাও, তার পর আমার কাছে আনিও।" তাঁহার আজ্ঞা পালিত হইল। তারপর পরমহংসদেব তিন দিনমাত্র সেই যুবকটীকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন; রাত্রে তিনি কখনও কোন ব্যক্তিকে নিকটে থাকিতে দিতেন না কিন্তু সেই ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে তিন রাত্রি নিকটে রাখিয়াছিলেন। চতুর্থ দিবস প্রভাতে তাহাকে আর কেহ দেখিতে পাইল না। সে কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল। পরমহংস দেব তাহাকে কি উপদেশ দিলেন তাহা কেহই জানে না। তার পর সে লোকটিকে কেহ কখনও দেখে নাই। কিন্তু যে দিন পরমহংসদেব দেহত্যাগ করেন, তাঁহার সেই প্রিয় শিষ্যটী সহসা আসিয়া উপস্থিত হইল। পরমহংসদেবের দেহান্তকালে একটি জ্যোতি বাহির হইয়াছিল। তাঁহাকে একটি চাদর আচ্ছাদন করিয়া সে সময়ে রাখা হইয়াছিল, দর্শকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই, কিন্তু ব্রহ্মতেজে সে চাদরখানা জ্বলিয়া উঠিতে অনেকেই দেখিয়াছে। পরমহংস বাবার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইবার পর তাঁর সেই প্রিয় শিষ্যটি তদবধি এখানেই বাস করেন, এবং তাঁহারও দেহান্ত হইলে ভক্তগণ পরমহংসদেবের সমাধিমন্দিরের পার্শ্বেই ইঁহাকে সমাধিস্থ করিয়া তদুপরি আর একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছেন।

সমাধিস্থানটি বড়ই নিভৃত ও মনোরম। সমাধিমন্দিরে আমরা অনেকক্ষণ বসিয়া বিশ্রাম করিলাম; স্থানের মহিমাতে মন পবিত্র ও শান্তিপূর্ণ হইল। মহাপুরুষের সমাধিক্ষেত্র স্বর্গতুল্য পুণ্যময়। পরমহংসদেবের একটি ভৃত্য ও ভক্ত সেই নির্জ্জন সমাধিমন্দিরে অদ্যাপি একাকী বাস করিতেছে। শুনিলাম তাহার নাম ঝাউ, লোকটী বোধ হয় পাহাড়ী। ঝাউ একটু নির্ব্বোধের মত দেখিতে, কিন্তু বড় ভাল মানুষ,—বড় বিনয়ী, সর্ব্বদাই হাস্যবদন। লোকটী লেখা পড়া জানে না, দিন, কাল, মাস বৎসরের হিসাবও

তাহার নাই। পরমহংসদেবের দেহান্তের পর সে প্রায় ২২ বৎসর একাকী এখানে বাস করিতেছে। তাহার সহিত আমাদের কথোপকথনের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বাবা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কতদিন এখানে আছ?" সে বলিল "৪।৫ বৎসর হবে মহারাজ।" "পরমহংস বাবার দেহান্ত কতদিন হইল হইয়াছে?' "তা ত আমি ঠিক বলিতে পারি না মহারাজ, ৩।৪ বৎসর হবে।" "এখানে তুমি একলাটি থাকিয়া কি কর?" "সাধুসেবা করি মহারাজ, মধ্যে মধ্যে সন্ন্যাসী সাধু প্রায়ই এখানে আসেন, তাঁহাদের সেবা করি, তাঁদের আহারীয় সংগ্রহ করিয়া দি।" 'তুমি আহারীয় কোথায় পাও?' 'বাজার হইতে ভিক্ষা করিয়া আনি মহারাজ।' "তোমাকে লোকে দেয়?" "হাঁ, পরমহংস বাবার ভৃত্য আমি, আমার অভাব কি?" "তুমি কি পরমহংস বাবাকে কখন দেখিতে পাও?" "হাঁ, মহারাজ, রোজ রাত্রে তিনি সমাধিমন্দিরে আসেন; তাঁহার জ্যোতিতে ঘর আলো হইয়া যায়।"

(ক্রমশঃ)

নিদ্রা।

পরিশ্রমে চিন্তাভারে অবসন্ন প্রাণ
বিশ্রামের শান্তিসুখ যবে পেতে চায়;
বিরামদায়িনী নিদ্রা নামি স্বর্গ হ'তে
কাতরে কোমল করে তোষে সযতনে।
শোকে দুঃখে মনঃকষ্টে জর্জ্জরিত প্রাণ
ব্যাকুলতা মাঝে যবে হয় নিরাশিত;
শুদ্ধ শান্তিময়ী নিদ্রা অনাহূতা হ'য়ে
বিস্মৃতির রাজ্যে তারে দেয় স্বপ্নসুখ।

এই নিদ্রা, মোহনিদ্রা, মহানিদ্রা কভু
স্থান কাল পাত্রভেদে মাত্র রূপান্তর;
রহুক জীবন কিম্বা হউক মরণ,
নিদ্রা বিনা নাহি গতি সন্তপ্ত জীবের।
যদি পারে করিবারে কেহ নিদ্রা জয়,
নরাকারে দেবতা সে অমর অব্যয়!

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মৃত্যু।

আমি বাল্যকালে পুরবাসিনী মহিলাগণের সহিত বাবার নিকটে পুরাণ শুনিতাম। বাবা তাঁহার স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে পুরাণ পড়িতেন, আমাদের যেই পৌরাণিক বীররসে হৃদয় ফুলিয়া উঠিত, করুণরসে চক্ষে ধারা বহিত, ভক্তিতে প্রাণ আর্দ্র হইত, রোষে বক্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠিত। কিন্তু এক দিন সহসা

বড় হাসিয়া শ্রোত্রীদিগের গাম্ভীর্য্য নষ্ট করিয়াছিলাম। শুনিলাম, যখন সামান্য অপরাধে ক্ষুদ্র দেবতা, প্রধান দেবতার কাছে অভিশপ্ত হইলেন যে—"পৃথিবীতে গিয়া মানবদেহ ধারণ কর," তখন ক্ষুদ্র দেবতা বজ্রাহতের মত হইলেন। তিনি জগতের সকল কষ্ট লইতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে অসম্মত। যক্ষরাজকুমার অভীষ্টদেবের পদতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন;

কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব;
তথাপি ভূতলে না যাইব"।

কিন্তু তাহা কিছুতেই রোধ হইল না। নূতন কার্য্যভার প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের মত দেবতা অপরাধী ভক্তের প্রতি স্বীয় আজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। তবে অনুগ্রহপূর্ব্বক স্বীকার করিলেন—"আমি তোমার সহায় থাকিব, বিপদে উদ্ধার করিব, কর্ম্মফল ভোগ হইলে আবার স্বর্গে আনিব," ইত্যাদি।

এইখানটায় বর্ষীয়সী শ্রোত্রীগণ হৃদয়ে কি অনুভব করিতেছিলেন জানি না।—আমি কিন্তু হাসিয়া কুটি! কুটি!

"অকারণে" হাসি দেখিয়া অনেকে বিস্মিতা হইলেন, একজন আত্মীয়া কিছু ভর্ৎসনাও করিলেন। তখন স্নেহময় বাবা পুস্তক রাখিয়া আমার মাথায় স্নেহের হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হাসিলে কেন মা?"

আমি অকপটে উত্তর করিলাম,—"বাবা! দেবতাদের ওরকম বুদ্ধি কেন? যাহারই পৃথিবীতে আসার আদেশ হয়, সেই কান্না কাটি জুড়িয়া দেয়, এখানে মানুষ হইবার এত ভয় কেন?"

বাবা একটু হাসিলেন, তার পরে বলিলেন,—"তুমি বড় হও, তার পরে সব বুঝিতে পারিবে।"

হায়! তখন আমি জানিতাম যে, জগতে আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, রামধনু উঠে, বাগানে ফুল ফুটে, গাছে গাছে ফল, জলাশয়ে জল, তরুশাখায় পাখীর গান, যেখানে বর্ষা, শরৎ, বসন্ত যাতায়াত করে, যেখানে গৃহ আছে, মাতা পিতার স্নেহ আছে, ভাই ভগিনীর ভালবাসা আছে, বন্ধু বান্ধবের প্রণয় আছে, যেখানে সুখ দুঃখে হৃদয়পূর্ণ সহানুভূতি আছে, সে জগতে আসিতে আবার কিসের দুঃখ? কিসের ভয়? এ কাণ্ডটা কি?

বাবা মহাপুরুষ ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন;—"বড় হইলে সব বুঝিবে"। তাঁহার বাক্য মিথ্যা হয় নাই। এখন বয়সের হিসাবে আমি অনেকেরই বড় হইয়াছি, অনেক রকম ঠকিয়াছি; সুতরাং অনেক রকম শিখিয়াছি—আর সেই কথা—মানবজন্মে কত দুঃখ, কত ভয়, তাহাও অনেক বুঝিয়াছি।

এই মরজগতের কথা বলিতেছি, এখানে ধর্ম্ম আছে, পুণ্য আছে, সরলতা আছে, সৌহার্দ্দ আছে, প্রেম আছে, আনন্দ আছে, বিশ্বাস আছে, সাধুতা আছে, এখানে কত সুখের উপাদান আছে, সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না,

আবার এখানে অধর্ম্ম আছে, পাপ আছে, কপটতা আছে, হিংসা আছে, বিশ্বাস ঘাতকতা আছে, শত্রুতা আছে, জরা আছে, রোগ আছে, দরিদ্রতা আছে, কত অসুখ কত অভাব বর্ত্তমান আছে—কিন্তু এ সব যদি কিছুই না থাকিত, তথাপি যে নির্ম্মম মৃত্যু এবং যে ভয়ানক মৃত্যুভয় আছে, তাহাতেই যে বলিতে ইচ্ছা করে—হে ভগবন্!—

কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব,
তথাপি ভূতলে না থাকিব।

বাস্তবিক মৃত্যু কি ভয়ানক ঘটনা! এ সংসারে এত যে মমতা, এত যে আসক্তি, এ সব ফেলিয়া কখন যে জন্মের মত চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার ঠিকানা নাই, অথচ নিশ্চিত যাইতে হইবে। স্বদেশভক্ত বীর রাণা প্রতাপই বল, আর দেশসেবক সাধক রমাকান্তই বল কত অসমাপ্ত কার্য্য রাখিয়া মৃত্যুর আহ্বানে তাঁহাদিগকে চলিয়া যাইতে হইয়াছে! এই যে পূজনীয় বামাবোধিনী-প্রবর্ত্তক মহাশয় সহস্র হস্তে স্বদেশের জন্য খাটিতেছিলেন, হৃদয়হীন মৃত্যু অনায়াসে তাঁহাকে লইয়া গেল, তাঁহার মত নর-দেবতার জীবন যে এ সংসারে কত প্রয়োজনীয় তাহা বুঝিল না! তাই বলিতেছি, যতই যাহা করি না কেন, সে নির্ম্মম আহ্বান যখনই আসিবে, তখনই আমাকে যাইতে হইবে। তখন হয় তো হাতের কাজ হাতেই রহিবে, মুখের কথা মুখেই রহিবে, আমি মমতাশূন্য উদাসীনের ন্যায় চলিয়া যাইব। এ সাধের জগৎ, মায়ার সংসার সব কোথায় পড়িয়া রহিবে, আমি অপরিচিত, অনাবিষ্কৃত, নূতন জগতে পৌঁছিব!—তাইতো বলিতে চাহি, —এ মানবজন্ম কেন দিয়াছিলে প্রভো! এ দেহ থাকিতে যদি জন্ম-মরণের রহস্য কিছুই বুঝিতে দিলে না, তবে এ দেহের বোঝা কেন বহাইলে?

এ তো গেল মৃত্যুভীতির কথা। আর যে একটা ঘটনায় মৃত্যুকে শত বজ্রের মত কঠোর বোধ হয় *। এ সংসারে যাহার জীবনে তোমার পরমায়ু, যার জন্য তুমি জীবিত ছিলে, যাহার একটু আদরে যাহার একটু আনন্দে, হৃদয় ভরিয়া অমৃতস্রোত উচ্ছ্বসিত হইত, যাহার সংসর্গে সমস্ত প্রাণকে পবিত্র, পরিতৃপ্ত এবং সম্পূর্ণ করিয়া দিত, যে সংসারের আশ্রয়, যে জীবনের অবলম্বন, সেই প্রাণাধিক আত্মীয় যখন কিছুই না বলিয়া তোমার সকল যত্ন চেষ্টা ও আয়াস ব্যর্থ করিয়া, অকস্মাৎ চলিয়া যায়—যখন তাহার সহিত জন্মের মত বিচ্ছেদ হয়, তখন যে একেবারে বজ্রাহতের মত চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পড়িতে হয়। অধিক কি, সর্ব্বশক্তিমান্ বিশ্বনিয়ন্তার দয়ার বিষয়েও দারুণ নৈরাশ্য উপস্থিত হয়, তাহা কয় জনে অস্বীকার করিতে পারে? তাই বলিতেছি, এই ভয়ানক মৃত্যু যখন নিত্য বিরাজমান, অনিশ্চিত

* বলা বাহুল্য, যাঁহারা যোগবলসম্পন্ন, পরাবিদ্যাবিদ, এ প্রবন্ধ তাঁহাদের জন্য নহে।

(লেখিকা)

সময়ে অতর্কিত রূপে জীবসমূহ যখন তাহার করাল কবলে নিপতিত হইতেছে তখন—

কুম্ভীপাক রৌরবে রহিব,
তথাপি ভূতলে না যাইব।”

এমনতর প্রার্থনা যে নিতান্তই স্বাভাবিক, এ কথা বলা বাহুল্যমাত্র।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ, আসক্তিশূন্য হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ কর, অর্থাৎ মাতা-পিতা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-ভগিনী, পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধু কাহাকেও “আমার” মনে করিও না। সবই ভগবানের বস্তু জানিয়া নির্লিপ্তচিত্তে আত্মকর্ত্তব্য পালন কর। খবরদার!—দয়া কর, কিন্তু মায়া করিও না। কার্য্যতঃ এই উপদেশ পালন করিতে পারিলে বুঝি মানবজন্মের যন্ত্রণা অনেক কমিয়া যাইত; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাধারণ নরনারীর অশাসিত হৃদয় এ রকম নিষেধবিধি মানিয়া চলিতে পারে না। যাঁহারা পরমাত্মীয় বা পরম বন্ধু, তাঁহাদিগকে “আমারই” জানিয়া একেবারে নিজ প্রাণের সহিত গাঁথিয়া ফেলে! সেই আত্মীয় বা বন্ধুর বিয়োগে মানব যে একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িবে, ইহা আর অসঙ্গত কি? আমাদের বঙ্গদেশের অনেক গৃহে এক জনের অভাবে আর এক জনের অথবা এক বৃহৎ পরিবারের সুখশান্তির সহিত মান সম্ভ্রম, অন্ন বস্ত্র পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে মানবজন্মের দুর্দ্দশা যতই হউক না কেন, শোকের আকুলতা কতকটা যে আমাদের অভ্যাসসাপেক্ষ, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ইতিহাস দেখাইতেছেন, ক্ষত্রিয়মহিলাগণ এবং রাজপুত রমণীগণ প্রিয়তম স্বামী ও পুত্রকে স্বহস্তে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করিয়া রণক্ষেত্রে পাঠাইয়াছেন এবং বলিয়া দিয়াছেন, “হয় বিজয়-গৌরব, না হয় মৃত্যু—ইহাই যেন তোমার অবলম্বন হয়।” বর্ত্তমান কালে আমাদের প্রতিবেশী জাপান মৃত্যুকে লইয়া কিরূপ ক্রীড়া করিতেছেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই জানেন। সেই জন্যই বলিতেছি, শোকের আকুলতা এবং মৃত্যুভীতি অনেকটা আমাদের অভ্যাসের ফল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তা' মৃত্যুভীতি এবং শোকের আকুলতা এই দুইটীর মূলে প্রধানতঃ একই কারণ বর্ত্তমান। সে কারণ পর জীবনের বা মৃত্যুর পরবর্ত্তী ঘটনার অজ্ঞানতা। মৃত্যু সম্বন্ধে সেই আবহমান কাল পর্য্যন্ত একটী প্রশ্ন চলিয়া আসিতেছে—সে কোথায় গেল?—যে আমাদের মধ্যে ছিল, আমাদের হইয়া, আমাদের সুখ দুঃখে আপনা ঢালিয়া, আমাদের প্রাণে প্রাণ মিশাইয়া যে আমাদেরই একজন ছিল, সে কোথায় গেল? আর সে আমাদের জন্য ভাবে না, তাহার জন্য কাঁদিয়া মরিলেও সান্ত্বনা করে না, তাহার অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিছু দেয় না, সে কোথায় গেল? এই প্রশ্নের উত্তরে

ঠাকুরমা, দিদিমাদের কাছে ভূত-প্রেতের ইতিহাস শুনিয়াছি, পুরাণ পরলোকে পাপীর নরক এবং পুণ্যবানের স্বর্গ-ভোগের কথা বলিয়াছেন, ধর্ম্মশাস্ত্র "মানব যেমন জীর্ণবস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, আত্মাও সেইরূপ রোগজরাদি দ্বারা জীবনী-শক্তিহীন দেহকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মান্তর বা দেহান্তর গ্রহণ করেন।" এইরূপে মানবীয় আত্মার অনশ্বরতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তার পরে মহাত্মা অল্‌কট্, মহাপ্রাণা আনিবেসান্ত হইতে "শোকবিজয়" ও "জন্মান্তররহস্য" প্রণেতা পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কত মন্তব্য কত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন, সিনেট্ সাহেব নাকি মানবের সূক্ষ্ম শরীরের ফটোগ্রাফ্ তুলিতে সাহসী হইয়াছিলেন, দেশীয় ভূতের রোজাগণের এবং বিদেশীয় মেসমেরিজমের অনুগ্রহে লোকান্তরিত ব্যক্তিগণ নাকি তাঁহাদের দেশের কথা, রীতি, নীতি, আচার ব্যবহারের কথা পর্য্যন্ত মানবসমাজে প্রচার করিতে সমর্থ হইতেছেন। হায়! তথাপি সেই চিরদিনের সমস্যার অদ্যাপি পূরণ হইল না! মৃত ব্যক্তি "কোথায় গেল?" এই মর্ম্মভেদী প্রশ্নের সর্ব্ববাদি-সম্মত সদুত্তর কোথাও পাওয়া গেল না। এক সম্প্রদায় যাহা প্রমাণীকৃত সত্য বলিয়া ঘোষণা করেন, অন্য সম্প্রদায় তাহাতে অভিসম্পাতপূর্ব্বক তাহার অসত্যতা প্রমাণ করিতে বসেন। লাভের মধ্যে যে সমস্যা, সেই সমস্যাই থাকিয়া গেল মানব মৃত্যুর ভয় হইতে নিস্তার পাইল না, শোকের তীব্রতা অসহ্যই রহিল।

বিরুদ্ধবাদী যাহাই বলুন আমার প্রিয় পাঠিকা ভগিনি! তোমার সহিত আমার একটী কথা আছে। আমার নিজের বিশ্বাস তোমাকে জানাইতেছিনা—আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করিতে পারি না—আমি বলিতেছি যে,—প্রিয় ভগিনি! যদি মৃত্যুভীতি পাইয়া থাক, যদি বড় আপনার জনকে হারাইয়া "তিনি (বা সে) এখন আছেন কি না" এই চিন্তায় অধীরা হইয়া থাক, তবে, এই বিশ্ব জগ-তের দিকে বিশেষ করিয়া চাহিয়া দেখ, তোমার প্রশ্নের উত্তর পাইবে। বিজ্ঞান আমাদিগকে প্রত্যক্ষ করাইতেছে যে, এ জগতের কোনও বস্তুরই ধ্বংস হয় না। এইটি বুঝিলেই আমরা বুঝিতে পারি বিশ্ব জগতের রেণুকণা, পরমাণু যখন অবিনশ্বর, তখন বিধাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যে মানব-জীবন, তাহা কেবলই খেয়াল চরিতার্থ করিতে, কেবলই ধ্বংসের জন্য কদাপি সৃষ্ট হয় নাই। যে মঙ্গলময় দেবতা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দিয়াছেন, রোগের ঔষধ দিয়াছেন ভালবাসায় সঞ্জীবনী সুধা দিয়াছেন, মায়ের পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপ শিশুর হাসিতে অমৃত দিয়াছেন, তিনি কখনই মানবজাতি অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। আমাদের পাপ, পুণ্য, অভাব, পূর্ণতা, প্রীতি, দয়া কিছুই নিরর্থক

নহে। তবে সে সার্থকতা কিসে, ও কোথায় হইবে, তাহা সেই দেবতাই বলিতে পারেন।

লেখিকা—শ্রীমা—

সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

ভ্রমান্ধ মানবেরা জগতে এই জাতিভেদ লইয়া, সোদরনির্ব্বিশেষ সজাতীয়গণের উপর যে বীভৎস, লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়া থাকে, তাহা ভাবিলে,—"অপি গ্রাবা রোদিত্যপি দলতি বজ্রস্য হৃদয়ম্" —পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রের হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। আমেরিকা ও আফ্রিকা প্রভৃতির আদিম জাতির উপর পাশ্চাত্য সভ্যজাতির এবং ভারতের চণ্ডাল, পরিয়া প্রভৃতির উপর জ্ঞানাভিমানী হিন্দুজাতির অত্যাচারের কথা শুনিলে, হিমশিলাও অগ্নিময় হয়, মহাদ্রিও বিচলিত হয়। মাদৃশ দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি সে সব বীভৎস কাণ্ড মনে করিলেও মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

ভগবৎকৃপায় মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হইতে এদেশে এক অপূর্ব্ব নব যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। তাঁহার পতিত-পাবনী শক্তি দ্বিতীয় ভাগীরথীর ন্যায় লোকের অশেষ মালিন্যরাশি বিধৌত করিয়া, উচ্চ নীচ ভেদাভেদ তিরোহিত করিয়া, এক অভিনব, প্রেমময়, আনন্দময় যুগ আনয়ন করিয়াছে।

ব্রহ্মৈকমেবাস্তি চ বেদ একো
ন জীবভেদোঽখিলবিশ্বমেকম্।
ধরাতলে তেন বিঘোষিতোঽয়ং
প্রেম্ণো মহাগিতিরনর্ঘ্যনীতিঃ॥

এক ব্রহ্ম, এক বেদ, জীবে জীবে নাহি ভেদ
নাহি উচ্চ নাহি নীচ, সবি একাকার;
এ অমূল্য মহানীতি—বিশ্বে প্রেম মহাগীতি,
চৈতন্য প্রভাবে ভবে হইল প্রচার।

আমাদের অস্থি মাংস মজ্জা-শোণিত, আমাদের প্রাণময় ও অন্নময় কোষ, সকলি যখন এই সাধারণজননী ধরণীদেবীর উপাদানে সৃষ্ট ও পুষ্ট, সেই "একমেবা-দ্বিতীয়ম্" ব্রহ্মই যখন আমাদের সকলের সাধারণ পিতা, তখন আমরা সকলেই এক পরিবার। অতএব অসংখ্য বিষয়ে অসংখ্য ভেদ বা বৈচিত্র্য থাকিলেও, আমাদের সাধারণ সন্ধিস্থল বা সংযোগ-ভূমি—ঈশ্বর ও জন্মভূমি। ঈশ্বরে ও জন্মভূমিতে সকলের অনুরাগ যদি অচল ও অকৃত্রিম হয়, জন্মভূমির সমুন্নতিই যদি সকলের অদ্বৈত লক্ষ্য ও সাধনা হয়, আমরা সকলেই যদি ধর্ম্মপ্রাণ হইয়া, একই ব্রহ্মমন্ত্রে দীক্ষিত হই, তবে গন্তব্যস্থানে পঁহুছিবই পঁহুছিব। কোনও বিঘ্ন বাধা আমাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিবে না। যেমন সাগরো-ন্মুখী নদীরা নানা পথে প্রবাহিত হইয়াও, নানা বাধায় প্রতিহত হইয়াও, সেই মহাসাগরেই মিলিত হয় তেমনি আমরা সকলে সমপ্রাণ ও একলক্ষ্য হইয়া চলিলে, সহস্র প্রকার বাধা সত্ত্বেও, আমাদের

সিদ্ধিক্ষেত্র—সেই মহাসঙ্গমে—সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানানন্দ-শিব-শক্তির মূলাধারে গিয়া মিলিত হইব। তখন ঐশী শক্তির ন্যায় আমাদের শক্তি অসীম ও অপরাজেয় হইবে। আমাদের এই সার্ব্বভৌমিক, অনন্যপায়ী একতাসাধনই সমাজের পূর্ণ সংস্কার। যে দিন এ দেশ ৩৩ কোটি দেবতা ও ৩৩ কোটি জাতিভেদ ছাড়িয়া, ধর্ম্মপ্রাণ এক-জাতি হইয়া, একই দেবতার ও একই মন্ত্রের উপাসক হইবে, সে দিন ভারতে নবসূর্য্যের উদয় হইবে। সেই পুণ্যময়, তেজোময়, শক্তিময়, প্রেমময়, শাশ্বত নবযুগের উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের সমাজে সত্য-ধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্ষয় পাইয়াছে। যাহা সনাতন ধর্ম্মশরীরের অঙ্গ নহে, এরূপ কতকগুলি অসার, অলীক বস্তু সত্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। প্রকৃত সত্যধর্ম্মের দিকে অল্পলোকেরই দৃষ্টি। বহিরঙ্গ কতকগুলি খুঁটিনাটি লইয়াই সমাজ ব্যতিব্যস্ত। এটা অশুচি, ওটা অস্পৃশ্য, সেটা খাইলেই জাতি যাইবে, অমুককে নিমন্ত্রণ করিলে বা অমুক স্থানে পদার্পণ করিলে সদ্যই জাতিপাত। ইত্যাদি অসংখ্যপ্রকার তুচ্ছ অথচ সমাজবিচ্ছেদ-কর বিষয় লইয়াই অনেকে ব্যস্ত। মানবের প্রকৃত জাতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি? সে পক্ষে অল্প লোকের দৃষ্টি। সমাজের বীভৎস মহাপাপীরাও ব্রাহ্মণ বা কুলীন নাম ধারণ করিয়া, সম্মান পাইয়া থাকেন। আর যিনি ঐরূপ 'ব্রাহ্মণ' বা কুলীন নহেন, তিনি অতিনির্ম্মলচরিত্র, পরোপকারী সাধু হইয়াও ঘৃণার্হ হয়েন। যাঁহারা ধর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা, তাঁহারা স্বয়ং নানা অধর্ম্মে দূষিত হইয়াও, সমাজে পূজনীয় হয়েন, কিন্তু তাঁহারাই অন্যের বেলায়, তাহার সামান্য খুটিনাটী ধরিয়া তাহাকে সমাজ-চ্যুত করেন। মানবের প্রকৃত জাতি, ধর্ম্ম ও কর্ম্ম কি? সে বিষয় অল্পলোকেই ভাবিয়া থাকেন। আমি একদা ৺কাশীধামে গঙ্গায় প্রাতঃস্নান করিয়া আসিতেছিলাম। আমার সঙ্গে কোনও একটী পরিচিত ব্রাহ্মণ পুষ্পাদি লইয়া বিশ্বেশ্বরমন্দিরে যাইতেছিলেন। সঙ্কীর্ণ পথে জনতার মধ্য দিয়া আসিবার সময়, উক্ত ব্রাহ্মণের গাত্রবাসের সহিত এক মুসলমানের অঙ্গস্পর্শ হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া, সেই মুসলমানকে গালি দিলেন এবং হস্তস্থিত পুষ্পগুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—আমার স্নান ও পুষ্পাদি সকলি নষ্ট হইল। মুসলমান বিনীতভাবে কহিলেন,—"মহাশয়! ক্ষমা করুন। দৈবাৎ অঙ্গস্পর্শ হইয়াছে, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে স্পর্শ করি নাই! আপনি বৃদ্ধ ও পণ্ডিত; এবং অনেকেরই গুরু। আপনাকে জিজ্ঞাসা করি,—ঈশ্বর কি কেবল ঐ মন্দিরটুকুর মধ্যেই আছেন? আপনারা তো বলেন,—ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বময়। তিনি যদি সর্ব্বব্যাপী হন, তবে যে ফুলগুলি আপনি পথে নিক্ষেপ করিলেন, তাহা সেই বিশ্বেশ্বরের চরণেই পতিত হইয়াছে।" আমি

সেই মুসলমানকে নমস্কার করিলাম, এবং নিম্নলিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া সেই ব্রাহ্মণকে উপহার দিলাম ;—

যেনৈব নাম্না ননু যত্র তত্র
ভক্ত্যা সমুদ্দিশ্য বলিং প্রযচ্ছ।
স তৎপদং যাস্যতি বিশ্বমূর্ত্তেঃ
ব্যাপ্তং যতো বিশ্বমিদং পদেন ॥

—যে নামে যেখানে ইচ্ছা হইবে তোমার,
ভাই রে! তাঁহারে তুমি দিও উপহার ;
ভক্তিভাবে যথা ইচ্ছা যে নামেই দিবে,
তব উপহার তাঁর পদেই পড়িবে ;
বিশ্বম্ভর বিশ্বনাথ বিভু বিশ্বাধার
পদতলে জুড়িয়া আছেন ত্রিসংসার।

এ কালে এ দেশের ভদ্রসমাজে যেরূপ অবরোধপ্রথা দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে তাহা ছিল না। নিম্ন শ্রেণীর শ্রমজীবিনী নারীদের মধ্যে অবরোধপ্রথা নাই। এই প্রথার অনুকূলে ও প্রতিকূলে অনেকে তর্ক করিয়া থাকেন। কোনও পক্ষের তর্ক যুক্তিশূন্য নহে। বোধ হয়, যবনাধিকারে উচ্ছৃঙ্খল যবনদিগের দৌরাত্ম্যে, অবরোধপ্রথা এ দেশে দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। সঙ্কীর্ণ স্থানে বা একস্থানে দীর্ঘকাল রুদ্ধ থাকা যে জীবমাত্রেরই শারীরিক শক্তি, পুষ্টি ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির পক্ষে এবং মানসিক বৃত্তিগুলির উৎকর্ষসাধনের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর, এ কথা সকলেই বুঝিতে পারেন। স্ত্রীচরিত্র-রক্ষার পক্ষে যে অবরোধপ্রথায় একান্ত প্রয়োজন, এ কথা স্বীকার্য্য নহে।

সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ মনু বলিয়াছেন ;—

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধাঃ পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানং যাস্তু রক্ষেযুস্তা এব স্যুঃ সুরক্ষিতাঃ॥"

—স্ত্রীলোকের আত্মীয় পুরুষেরা স্ত্রীগণকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, তাহারা সুরক্ষিতা হয় না। যাহারা স্বয়ং আপনাকে রক্ষা করিতে পারে, তাহারাই সুরক্ষিতা। "চারিত্রকবচাঃ স্ত্রিয়ঃ"—চরিত্রই স্ত্রীলোকের রক্ষাকবচ। কথাগুলি অলন্ত সত্য।

বর্ত্তমান অবরোধপ্রথা সদোষ হইলেও, আমি স্ত্রীগণকে সর্ব্ববিষয়ে অবাধ স্বাধীনতা দানের পক্ষপাতী নহি। গন্তব্য স্থানে সর্ব্বদা সুরক্ষিত ভাবে গতিবিধি করাই স্ত্রীলোকের উচিত। সমুন্নত প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা ছিল না। বৈদিক গ্রন্থে ও রামায়ণ ভারতাদি প্রাচীন ইতিহাসে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রাচীন ভারতের বীরাঙ্গনারা শস্ত্রধারণপূর্ব্বক যুদ্ধ করিতেন, কেহ যুদ্ধোপকরণ বহন করিতেন,কেহ আহতগণকে শুশ্রূষা করিতেন, কেহ যুদ্ধের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন, কেহ রণসঙ্গীত গান করিয়া যুদ্ধে উৎসাহ দিতেন। ঋগ্বেদে লিখিত আছে ;—খেলনামক রাজার পত্নীর নাম বিশ্‌পলা। যুদ্ধে তাঁহার একখানি চরণ ছিন্ন হইয়াছিল। রাজপুরোহিত অগস্ত্যদেব ভিষক্ অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের স্তব করায়, তাঁহারা আসিয়া, লৌহময় চরণ নির্ম্মাণ করিয়া বিশ্‌পলার দেহে সংযোজিত করিয়াছিলেন। ছিন্নপক্ষ বিহঙ্গমের নূতন পক্ষ লাভের ন্যায় বিশ্‌পলা সেই নূতন চরণ লাভ করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন করিতে

পারিতেন। উপনিষদে আত্রেয়ী-নাম্নী বিদুষীর পরিচয় পাওয়া যায়, তিনি বেদ-স্থক্তের রচয়িত্রী। আত্রেয়ী নামে অপর এক নারীর বিবরণ লিখিত আছে। তিনি একাকিনী সুদুর্গম দণ্ডকারণ্য অতিক্রম পূর্ব্বক, পুঁথি লইয়া মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট বেদান্ত শিখিতে গিয়াছিলেন। ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর কথা অনেকে জ্ঞাত আছেন। রাজর্ষি জনকের যজ্ঞসভায় যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার বিচারে সমস্ত ঋষিমণ্ডলী পরাভূত হইলে, গার্গী সভায় উপস্থিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যের সহিত বেদান্তশাস্ত্রের বিচার করিয়াছিলেন। স্ত্রীস্বাধীনতার বিষয়ে এবং স্ত্রী-জাতির সমস্ত বিদ্যায় ও সামাজিক কার্য্যে অপ্রতিহত অধিকার বিষয়ে প্রাচীন শাস্ত্রে বহুতর প্রমাণ আছে। এ সকল কথা "রমণীরত্নমালা" নামক গ্রন্থে আমি শীঘ্রই প্রকাশ করিব, এজন্য এস্থলে দিলাম না। ভারতের আধুনিক ইতিহাসেও, রাজস্থানের বহু বীরাঙ্গনার ও ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই প্রভৃতির যুদ্ধক্ষেত্রে গমনপূর্ব্বক যুদ্ধ করার কথা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(ক্রমশঃ)

তাপস তনয়।*

ছিল কি না ছিল মাতা না জানি নিশ্চিত,
পিতার যতনে আমি হয়েছি পালিত।
ধূলায় ধূসর অঙ্গ কাঁদিতাম যবে,
লইতেন ক্রোড়ে পিতা বাছা বাছা রবে।
পিতার মধুর ভাষে কান্না গিয়ে ভুলে,
হাসিতাম প্রেমভরে হৃদি-পদ্ম খুলে।
কহিতাম কত কথা আধো আধো বোলে,
স্নেহপূর্ণ কথা পেয়ে থাকি পিতৃকোলে।
পিতৃমুখ হতে কত স্নেহপূর্ণ বাণী,
পেয়েছি, বলিতে নারি সে সব বাখানি।
তাপসতনয় আমি, আমি তো তাপস,
পিতৃগুণ লভিবারে করেছি মানস।
পিতার বিহনে থাকে পিতৃধন যত,
পুত্রগণ সমভাগে পায় বিধিমত।
চাহিনা রতন রাজ্য ধন আর মান,
লভিতে বিচিত্র হর্ম্ম্য নহি আগুয়ান,
ভ্রাতৃগণ লহ সব পিতৃত্যক্ত ধন,
লভিতে সে সব মম সরে নাকো মন।
যা চাই তা লভিয়াছি পিতৃধন ব'লে,
অংশ যার কেহ নিতে না পারিবে বলে।
শিশুকাল হতে পেয়ে পিতৃ-উপদেশ,
সঞ্চয় করেছি ধন নাহি তার শেষ।
অপরে সাজায় পুত্র-গাত্র অলঙ্কারে,
ভূষণ দিতেন বাবা হৃদয়মাঝারে।
দৃষ্টিমাত্র অঙ্গভূষা দস্যু নেবে কেড়ে,
যত দিবে ততগুণে যাবে ইহা বেড়ে।
বৎস যথা গাভী সনে থাকে অবিরত,
থাকিতাম পিতৃসনে, তাঁর ছায়ামত।

* ব্যক্তিবিশেষের প্রকৃতিগত ঘটনাবলি অবলম্বন করিয়া রচিত।

শুনিতাম যবে বাবা গাইতেন গান,
দেখিতাম যবে তিনি করিতেন ধ্যান;
শোকার্ত্তে সান্তনা আর দয়া দীনজনে,
তাঁহারি কৃপায় আমি শিখেছি যতনে;
আত্মস্বার্থ অবহেলি কিরূপে নিয়ত
পরহিত কার্য্যে পিতা থাকিতেন রত;
ক্ষুধার্ত্তে তৃষিতে দিয়া নিজ অন্নজল,
আনন্দে নয়নে বারি ঝরিত কেবল।
এক দিন অপরাহ্নে কাশী পুণ্যধামে,
জাহ্নবীর তটে বাবা, আমি তাঁর বামে;
উপবিষ্ট পিতা-পুত্রে ঈশ্বরচিন্তায়,
থাকিলাম কিছুক্ষণ দিবা শেষ প্রায়।
ধ্যানশেষে মৃদু মৃদু করি গুণ গুণ,
কহিলা-অমৃতভাষে,-"গাও বিভুগুণ"।
ধরিলাম গান আমি পিতৃদেব সনে,
গাহিলাম কিছুক্ষণ একতান মনে।
উচ্ছ্বসিত প্রেমানন্দে অশ্রুনীরে ভাসি,
গাহিলেন বাবা মোর বিভুগুণরাশি।
দিন যায় রাত্রি আসে গোধূলি বেলায়,
নাচিছে গঙ্গার জল মৃদু মন্দ বায়।
কুল কুল কুল স্বরে রজতবাহিনী,
প্রকাশি বিমল হৃদে বিভুর কাহিনী,
চলিছে বিশালার্ণবে ফিরিয়া না চায়,
মিশাবে আপন কায়া অনন্ত কায়ায়।*
পারাবারে লক্ষ্য রাখি সেই দিকে ধায়,
পথে কত পিপাসুর পিপাসা জুড়ায়।
কোটি কোটি পিপাসুকে করে বারি দান,
কিন্তু কভু না মাগিছে তার প্রতিদান।
সংসারে মানবজন্ম সকলের সার,
সার চিন্তা না থাকিলে সকলি অসার।
আমার এ ক্ষুদ্র দেহ অনন্তে (১) মিশাতে,
কিরূপে রাখিব লক্ষ্য জীবন-প্রভাতে (২)
বহাব জীবন-স্রোত সেই বিভু প্রতি,
স্রোতস্বিনী মত রাখি দীনজনে মতি।
দয়াস্রোত বহে যদি স্রোতস্বিনী যথা,
উদ্দেশ্য হইবে সিদ্ধ নহিবে অন্যথা।
এইরূপ চিন্তামণি-চিন্তায় চিন্তিত,
গভীর ধেয়ানে মন আছে নিয়োজিত।
হেন কালে স্নেহ-হস্ত রাখি পৃষ্ঠোপরি,
কহিলেন পিতৃদেব "দেখ ত্বরা করি,
কে কাঁদিছে গঙ্গাতটে করি আর্ত্তনাদ,
বুঝিনু কাহার এবে ঘটিল প্রমাদ"!

(ক্রমশঃ)

* বিশাল কায়ায় অর্থৎ সমুদ্রে।
(১) অনন্তে—অনন্ত পুরুষ ঈশ্বরে।
(২) জীবন প্রভাতে—শিশুকাল হইতে।

পরিবার-গঠন ও সন্তানপালন।

পরিবারগঠন সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের দেশে সকল পরিবারেরই এক বিশেষ চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান শিক্ষা ও স্বাধীনচিন্তার স্রোতের মধ্যে প্রাচীন-ভাবে চলিলে হইবে না, বিশেষ চিন্তা করিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। বহু প্রকার চিন্তার মধ্যে আমরা একটী চিন্তা সকলের নিকট উপস্থিত করিতেছি। পরিবার গঠন করিতে হইলে ছেলে, মেয়েদিগকে সুশিক্ষা দিতে হইবে। কর্ত্তা

ও গৃহকর্ত্রীকে এক হইতে হইবে, ভিন্ন প্রকৃতির কর্ত্তা কর্ত্রী, কি বিভিন্নমতাবলম্বী গৃহকর্ত্তা ও কর্ত্রী পরিবার গঠন সম্বন্ধে দুজনে একমতাবলম্বী হইবেন; গৃহের শৃঙ্খলা বা সন্তানপালন ও সন্তানদের সুশিক্ষা সম্বন্ধে দুজনে এক হইতে না পারিলে কিছুতেই আশানুরূপ ফল লাভ করিতে পারিবেন না। এই একত্ব সাধন করিতে হইবে। তাহা হইলে গৃহে সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতে পারিবেন এবং সন্তানগণকে মানুষ করিতে পারিবেন, নতুবা কর্ত্তা একদিকে যাইবেন ও কর্ত্রী অন্য দিকে যাইবেন, অথচ পরিবার সুন্দরভাবে গঠিত হইবে, সন্তানেরা মানুষ হইবে, সে আশা বিড়ম্বনা। বিশেষ ভাবে এই একত্ব সাধন করুন, গৃহে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে। এই একত্ব সাধন, ঈশ্বরকে লইয়া করিতে হইবে, ধর্ম্ম ভিন্ন এই একত্ব সম্ভবপর নয় এবং তাহা কল্যাণজনকও নয়। এই একত্ব সাধনের অভাবে পিতামাতা সন্তানদের পালন ও শিক্ষা বিষয়ে একমত হইতে না পারাতে গৃহে যে কি অশান্তি এবং সন্তানদের যে কি দুর্গতি হইতেছে তাহা বলা যায় না। আজ তাহার একটী বিষয় উল্লেখ করিতেছি। অনেক মা মনে করেন, ছেলে মেয়েদিগকে ভাল খাওয়াইলে ও ভাল পরাইলেই তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইল। এইরূপ পিতারও কোন বিষয়ে ভিন্ন মত আছে। দুজনে একমত না হইলে যে সন্তানেরা সুসন্তান হইবে না, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

অনেকের মতে আহার ও পরিচ্ছদের সঙ্গে ধর্ম্মজীবনের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা দৃষ্টান্তস্থলে অনেক সাধু সাধ্বী নরনারীর নাম উল্লেখ করেন। মনুষ্যজীবন গঠিত হইলে হয় ত আহার ও পরিচ্ছদে তাঁহাদের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না ঘটিতে পারে, কিন্তু জীবনগঠনের সময়ে যেরূপ আহার ও পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিবে তাহাতে জীবন অনেকটা সেই ভাবাপন্ন হইবে তাহাতে সন্দেহ করা যায় না। তাই গঠিত জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া অগঠিত জীবনকে অসংযমের দিকে উৎসাহিত করা উচিত নয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেক মা মনে করেন,—ছেলে মেয়েদিগকে ভাল খাওয়ান ও ভাল পরান খুব উচিত। ভাল খাওয়া ও ভাল পরার ত আবশ্যকতা আছে, কিন্তু তাহা এরূপ নহে যে তাহাতে ছেলে মেয়েরা সুখপ্রিয় ও স্বার্থপর হইয়া যাইবে বা অসংযত হইবে। ছেলে মেয়েরা যে সুখপ্রিয় ও স্বার্থপর হইতেছে মায়েরা যে তাহা বুঝেন না তাহা নয় এবং তাহাদের যে খুব সংযমের অভাব তাহাও বেশ বুঝেন, এবং তাঁহারা অন্যদের কথা কেন, নিজেদের কথা ভাবিলেই বুঝিতে পারেন, সেই ছেলে মেয়েরাই শিক্ষিত, সাধুচরিত্র, সৎকর্ম্মশীল ও ধর্ম্মপরায়ণ হইয়াছেন, যাঁহারা বাল্যে সংযতভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন। এমন ভাবে গঠিতজীবন বাবা মাকেও দেখি—ছেলে মেয়েদের আহার ও পরিচ্ছদাদি সম্বন্ধে অসংযত। ইহা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহারা সন্তানে

বিষম মোহযুক্ত এবং তাঁহারা নিজ জীবন ভুলিয়া স্বার্থপর জীবনকে আদর্শ করিয়াছেন। অনেক ছেলে মেয়ে দেশীয় ভাবে আহার ও পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করে। তাহারা বিদেশী আহারের পক্ষপাতী এবং বিদেশী পরিচ্ছদ ব্যবহারকেই সম্মানিত মনে করে। তাহারা যদি দেশের প্রতি উদাসীন হয়, কি ঘৃণা প্রকাশ করে, তাহারা যদি দেশের লোকের সঙ্গে মিশিতে না চায়, তবে তাহাদের দোষ কিছুই নাই, সম্পূর্ণ পিতামাতার দোষ। মায়ের উপর সন্তানদের সম্পূর্ণ ভার থাকা উচিত। এ বিষয়ে পিতার কিছুই বলা ভাল নয়। তবে যেখানে দেখা যায়, মা কিছু করিতে পারিতেছেন না, সেখানে মাকে ছাড়িয়া দিতে হয় এবং পিতার অধীনে মা সন্তানদিগকে রাখিবেন। অনেক গৃহে এইরূপ বন্দোবস্তের অভাবে সন্তান সকল বিপথগামী হইতেছে। মায়েরা ভাবুন,—ঈশ্বর তাঁহাদের হস্তে কি পবিত্র ও গুরুতর কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিয়াছেন। ঈশ্বরের দাসী হইয়া তাঁহার প্রেমে পূর্ণ হইয়া সন্তানপালনে নিযুক্ত থাকুন। যেন তাঁহাদের সন্তানগণ পরিবার ও সমাজের অলঙ্কার হইতে পারে। আহার ও পরিচ্ছদ সর্ব্বদাই বলকারক ও স্বাস্থ্যকর হইবে, কিন্তু কখনই বিলাসজনক হইবে না। মায়েরাই এ বিষয় ভাল বুঝেন, তবে মোহমুক্ত না হইলে ভাল বুঝিয়াও ফল নাই। এই জন্য সকল বিষয়েই সন্তানের ভাবী কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ধর্ম্মপ্রাণা হইয়া সন্তানসেবায় নিযুক্ত থাকুন, এই ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দাস।

দ্বারিকানাথ মিত্র।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(দ্বিতীয় প্রস্তাব।)

সহৃদয় বিচারপতি লুই জ্যাকসন সাহেব দ্বারিকানাথের অকালমৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলে পর, তদানীন্তন প্রবীণ ব্যারিষ্টার ব্রেসন সাহেব কহিলেন, "বিচারবিচক্ষণ ও প্রতিভাশালী দ্বারিকানাথ মিত্রের পরলোকগমনে আমাদের ইউরোপীয় সমাজ একজন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পরমহিতৈষী বন্ধু এবং বাঙ্গালি সমাজ একজন অতুলনীয় মহাপুরুষকে হারাইয়া অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, ইহা ধ্রুব সত্য। দ্বারিকানাথ মিত্র রাজা ও প্রজা এতদুভয়েরই পরম কল্যাণাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। জনসাধারণ তাঁহার নিকটে নানা কারণে বিশেষরূপে ঋণী আছে। শিক্ষা বিভাগ, বিচার বিভাগ, আইন বিভাগ, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি যে কোন বিভাগের বিষয় লইয়া আলোচনা করি, দ্বারিকানাথকে তথায়

অলঙ্কারস্বরূপ শোভমান দেখিতে পাই। তিনি অসাধারণ গুণশালী পুরুষ ছিলেন। আমি আশা করি, বন্ধুবর মিত্র মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ জন্য এবং তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য, কলিকাতা মহানগরীতে আমরা সত্বরে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন দেখিতে পাইব। আমি শুনিয়া সুখী হইলাম, হাইকোর্টের এতদ্দেশীয় বারিষ্টার ও উকীলগণ আইন-পুস্তকাগারে (বার লাইব্রেরিতে) শীঘ্র একটী সভা আহ্বান করিবেন। তাহাতে মিত্র মহোদয় সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আলোচিত হইবার সম্ভাবনা আছে। দ্বারিকানাথ সম্বন্ধে অদ্যাপি অনেক কথা সর্ব্বসাধারণে অবগত হয় নাই, তাঁহার অনেক গুণ ও অনেক শক্তি ছিল। মানুষ যতদিন না মরে, যতদিন পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার বিয়োগে অভাব বোধ না করি, ততদিন পর্য্যন্ত সেই মানুষের যথার্থ সামর্থ্য এবং সমাজের সহিত সেই মানুষের যথার্থ সম্পর্ক ও স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না।”

কিয়দ্দিবস পরে হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে স্বদেশী ব্যবহারাজীবিবর্গের সভা আহূত হইলে, তৎকালের খ্যাতনামা সরকারী উকিল রায় জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কহিয়াছিলেন, “অনেকে দ্বারিকানাথ মিত্রকে গোঁড়া হিন্দু বলিয়া ভাবিত, কেহ কেহ ইহাকে ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য যুবকদিগের ন্যায় যথেচ্ছাচারী বলিয়াও বিবেচনা করিত, কিন্তু মিত্র মহাশয় নিতান্ত গোঁড়া ছিলেন না এবং নিতান্ত ইংরাজী সংস্কারকদলের লোকের প্রকৃতিসম্পন্নও ছিলেন না। হিন্দুসমাজকে তিনি ভাল বাসিতেন এবং হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজকে অন্যায়রূপে উপেক্ষা করিতেন না; কিন্তু তথাপি তিনি উদারতায় কখন অমর্য্যাদা করেন নাই। আবশ্যক হইলে তিনি ন্যায়, সত্য ও সদ্যুক্তির অনুরোধে কখন কখন সমাজের সঙ্কীর্ণ সীমাকে অতিক্রম করিয়া বিশ্বজনীন উদারতার বিশাল রাজ্যে অবতীর্ণ হইতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহার অনেক মত আমার মতের সহিত মিলিত। * * স্ত্রীশিক্ষাবিষয়ে অনেক সময়ে আমরা পরস্পর কথোপকথন করিয়াছি। এতৎসম্বন্ধে তিনি অতি উৎকৃষ্ট পরামর্শ দিতেন এবং তাঁহার মন্তব্যসমূহ অত্যন্ত সারবান্ ছিল। ইউরোপের নারীনিচয়ের ন্যায় এদেশের স্ত্রীলোকগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা পাউক, ইহা তাঁহার মত ছিল না; কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। স্ত্রীলোক ও বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য তিনি অনেক প্রকারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। দ্বারিকানাথ নিজে ঘোরতর মাংসাশী ছিলেন, কিন্তু নিরামিষভোজন সম্বন্ধে অনেক সময়ে অনেক লোককে পরামর্শ দিয়াছেন, ইহা শুনিয়াছি। তাঁহার একটি কথা বড়ই সুন্দর ছিল। তিনি প্রায় সর্ব্বদা কহিতেন, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়া যে ব্যক্তিকে উদর পূরণ করিতে না হয়, তাহার তুল্য হতভাগ্য জীব ধরাতলে আর

দ্বিতীয় নাই। ছেলেদের লেখা পড়া শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার এই মত ছিল যে, উত্তমরূপে বাঙ্গালা না শিখাইয়া কেহ যেন তাহার সন্তানকে ইংরাজী বর্ণমালা না শিখায়।"

সুবিদ্বান্ বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্র মহাশয়. হিন্দুর স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা মনোমধ্যে পোষণ করিতেন, তাহা অবগত হইবার জন্য অনেক পাঠক ও পাঠিকার ঔৎসুক্য জন্মিতে পারে। আমরাও নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া এই প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে কিছু কাল অনুসন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হই নাই। অবশেষে সে কালের "সোমপ্রকাশ" নামক প্রসিদ্ধ সমাচারপত্র পাঠ করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। তখন এদেশে ইংরাজীতে হিন্দুপেট্রিয়ট এবং বাঙ্গালায় সোমপ্রকাশ নামে সংবাদপত্র ছিল। পণ্ডিত দ্বারিকানাথ বিদ্যাভূষণ ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সে সময়ে সোমপ্রকাশ সম্পাদন করিতেন। একখানা অতীব পুরাতন সোমপ্রকাশে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দ্বারিকানাথের যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই এস্থলে সংক্ষিপ্তভাবে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি সোমপ্রকাশের ঐ সংখ্যা অতি পুরাতন এবং অতি মলিন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, ইহার অনেক স্থান ছিন্ন ও বিচ্ছিন্ন, সুতরাং আদ্যোপান্ত পরিষ্কার করিয়া পাঠ করা সুকঠিন। তথাপি যতটুকু পড়া যায়, তাহাতে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবার সম্ভাবনা আছে।

সেকালে কলিকাতার সন্নিহিত ভবানীপুরে আত্মতত্ত্ববোধিনী নামে এক সভা ছিল। হাইকোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি মাঞ্জবর শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহোদয়ের পুত্র খ্যাতনামা প্রাণনাথ পণ্ডিত মহাশয় এই সভায় এক বার্ষিক অধিবেশনে "আমাদের সমাজের সংস্কার" এই বিষয়ে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। দ্বারিকা নাথ মিত্র এই অধিবেশনে সভাপতির পদে বরিত হইয়াছিলেন। প্রাণনাথের* বক্তৃতা শেষ হইলে, রায় বাহাদুর কুঞ্জলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (ছোট আদালতের জজ) মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করেন। তদনন্তর সভাপতি মহোদয় বক্তৃতা আরম্ভ করিয়া যাহা কহিয়াছিলেন. তাহার সারাংশ ঐ সোমপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এস্থলে আমরা কেবল তাঁহার স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

দ্বারিকা বাবু কহিলেন,—"মানুষকে দুইটা পা, দুইটা হাত, দুইটা কাণ, দুইটা চক্ষু অথবা দুইটা নাসিকা না দিয়া যদি কেবল একটী করিয়া দেওয়া হয়, তাহা

* পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী, এম, এ, বি, এল, মহাশয় সংস্কৃত কলেজের প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। হাইকোর্টে ওকালতী করিয়া তিনি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত কতকগুলি উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী পুস্তক আছে।

হইলে তাহার অবস্থা কিরূপ হয় ভাবিয়া দেখ। সেইরূপ মনুষ্যসমাজে কেবল পুরুষের অথবা কেবল স্ত্রীলোকের উন্নতি হইলে সমাজ স্থির থাকিতে পারে না। সমাজকে সবল সুস্থির ও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন করিতে হইলে পুরুষ এবং স্ত্রীলোক এতদুভয়েরই উন্নতি হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোক আমাদের গৃহিণী, স্ত্রীলোক ভিন্ন গৃহস্থ থাকিতে পারে না, এই জন্য স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা রক্ষা করা এবং স্ত্রীলোকের সুশিক্ষার বিধান করা নিতান্ত আবশ্যক। যে সমাজে রমণী শিক্ষিতা, সুস্থা, বলশালিনী ও চরিত্রবতী না হন, সে সমাজ নিতান্ত হতভাগ্য এবং নিশ্চয়ই পতনের যোগ্য। বৃক্ষের মূল ছেদন করিয়া তাহার পাতায় জল নিক্ষেপ করিলে গাছ যেমন বাঁচে না, স্ত্রীলোককে মূর্খ অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিয়া কেবল পুরুষের শিক্ষা স্বচ্ছন্দতা ও স্বাস্থ্যের দিকে দৃষ্টিবান্ হইলে সমাজ কখনই সবল হইবে না এবং স্ত্রীলোক বিনা পুংসমাজও উত্তমাবস্থায় থাকিতে সমর্থ হইবে না; সুতরাং স্ত্রীলোকদিগের প্রতি বিশেষরূপে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। স্ত্রীলোক আমাদের গৃহিণী, প্রতিপালিকা জননী, রক্ষয়িত্রী, সহধর্ম্মিণী সেবিকা, গুর্ব্বী এবং প্রহরিণী স্বরূপা। যে গৃহস্থে স্ত্রীলোকের আদর নাই, শাস্ত্রকারগণের মতে সে গৃহ শ্মশানতুল্য এবং সর্ব্বদা সে স্থান অসুখের আকর। অনেকে কহিয়া থাকেন, স্ত্রীলোকগণকে লেখা পড়া শিখাইলে তাহারা এমন সৌখীনা হইয়া উঠে যে, গৃহকর্ম্মে আর মন দেয় না এবং কুস্বভাবা ও চরিত্রহীনা হইয়া যায়। আমার মত এই, প্রকৃত লেখা পড়ায় মানুষের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। যেখানে লেখা পড়া শিখিয়া কাহাকেও অধমাবস্থায় পতিত হইতে দেখি, সেখানে বুঝিতে পারি—প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, কুশিক্ষার কুফলে এইরূপ ঘটিয়াছে। অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম এবং অর্থব্যয় করিয়াও যদি দেখিতে পাও, বৃক্ষে ফল ফলিল না তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, বৃথা যত্ন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করা হইয়াছে।

(ক্রমশঃ)

হিমাচল।

বিশ্বের বরেণ্য যোগী ওহে হিমাচল!
মহতী মুরতি হেরি ভুলেছি সকল।
অসহ্য সংসারতাপ বজ্রপ্রহরণ,
মানবের ক্ষুদ্র কথা ধূলায় ক্রীড়ন।
কিছুই জাগে না দিতে বাধা এ পরাণে,
ধ্যানমগ্ন মূর্ত্তি হেরি ভক্তি শ্রদ্ধা মনে।
এই ত সে তপোবন—যথায় বসিয়া,
আর্য্যগণ বেদগান সুধাতে মজিয়া,

জগতে দিতেন ঢালি ধর্ম্মের প্লাবন,
সেই মহাধারে আজো বরাঙ্গশোভন।
সেই প্রেম-শান্তিধারা সদা প্রবাহিত,
দুঃখিজনচিত্ত হয় শান্ত সমাহিত
অনন্ত যোগেতে মগ্ন পবিত্র অচল!
তুলনা কোথায় তব? হেন শান্তিস্থল!
সকলের তরে মুক্ত অবারিত দ্বার;
নির্ঝরে শ্রবণে ঢালে প্রেমের ঝঙ্কার।
নীরবে প্রকৃতি সতী পুণ্য তপোবনে।
ঢালিছেন শীতলতা দুঃখীর পরাণে।
এসেছি ছুটিয়া তাই ভাঙ্গা প্রাণ লয়ে,
ভুলেছি অসহ্য তাপ তোমায় হেরিয়ে
আমার স্রষ্টাকে পূজি ও মুরতি সনে।
তিনি আর আমি এক যেন এ ভুবনে।

স্বর্ণপ্রভাবয়ু।
দার্জিলীং।

পাচন ও মুষ্টিযোগ।

শ্বাসকাশ (হাঁপানি) রোগের মহৌষধ — ক্ষুদ্র ভেক, যাহা সচরাচর বর্ষাকালে ঘরের জলভরা কলসী প্রভৃতির নিকট থাকে, তাহার হৃৎপিণ্ডের একটু ক্ষুদ্র অংশ পাকা কলার মধ্যে পুরিয়া খালিপেটে প্রাতে এক-বার মাত্র খাইলে হাঁপানিরোগ আরোগ্য হয়। এক দিন সেবনে না সারিলে, ঐরূপে তিন দিন সেবন করিবে।

Dysmenorrhœa (রক্তপ্রদর বিশেষ) —ঋতুকালে প্রথমে অল্প অল্প রক্তস্রাব হয় ও তলপেটে প্রবল ব্যথা হয়। কাহারও কাহারও প্রথমে সামান্য রক্তস্রাব হইয়া পশ্চাৎ অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হইতে থাকে। ওলটকম্বলের গাছের সরু সরু শিকড়ের ছাল ২০ গ্রেণ (দশ রতি) ২৫টী গোলমরীচের সঙ্গে বাসি জলে পরিষ্কার শিলায় বাটিয়া উহা বাসি জলে গুলিয়া, ঋতুর প্রথম দিন হইতে প্রাতে খালিপেটে সেবন করিবে। এইরূপ তিন দিন সেবনে রোগের শান্তি হয়।

নূতন সংবাদ।

১। শোকসংবাদ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত নিম্নলিখিত তিনটি নিদারুণ শোকসংবাদ প্রকাশ করিতেছি :—

(ক) ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট ভারতবন্ধু মহাত্মা লর্ড রিপণ আর এ জগতে নাই। তিনি একদা স্বজাতির সহস্র লাঞ্ছনা তৃণজ্ঞান করিয়া কোটি কোটি ভারতবাসীর অশেষ কল্যাণসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিলেন। ভারতে স্বায়ত্তশাসন-প্রবর্ত্তনের তিনিই মূল। জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে রাজকার্য্যাদি সকল বিষয়ে ভারতবাসীকে অধিকার দান তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তিনি এ দেশ ত্যাগ করিয়া এ দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণচিন্তায় বিরত ছিলেন না।

বিগত ১০ই জুলাই শনিবার ভারতবাসীকে অশ্রুনীরে ভাসাইয়া লর্ড রিপণ স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তাঁহার এ মহাপ্রস্থান ভারতবাসীর মহাগুরুনিপাতের ন্যায় শোচনীয়! মঙ্গলময় ঈশ্বর কোটী কোটী প্রজার ভক্তিভাজন সেই ক্ষণজন্মা মহাত্মার আত্মার শাশ্বত মঙ্গলবিধান করুন।

(খ) কাকিনার পুণ্যশ্লোক রাজা মহিমারঞ্জন আমাদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া অমর ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় উদারচেতা, মহানুভব, দীনবৎসল ভূস্বামী অতীব দুর্লভ। প্রত্যহ নিজ প্রজাগণের অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করা এবং যথাসাধ্য তাহাদের অভাব মোচন করা তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহার সহিত ক্ষণকাল কথোপকথন করিলে কেহ প্রাণান্তেও তাঁহাকে ভুলিতে পারিত না। সকল বিষয়ে ও সর্ব্ব কার্য্যেই তিনি বিশ্বজনীন উদার মতের পোষণ ও অনুবর্ত্তন করিতেন। দানকালে নিজ আয়ের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য থাকিত না। তিনি বলিতেন,—"দশ জনকে দিবার জন্যই ঈশ্বর আমাকে এ সম্পদ্ দিয়াছেন, সেই দয়াময়ই দিতেছেন, আমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। তাঁহার ধর্ম্মমতও তাঁহার দেবহৃদয়ের উপযুক্ত ছিল। তিনি একেশ্বরবাদী হইয়াও কোনও ধর্ম্মেরই নিন্দা বা অনাদর করিতেন না। তাঁহার হৃদয় যেরূপ উচ্চ, কার্য্যও সেইরূপ মহৎ এবং মূর্ত্তিটীও সেইরূপ সৌম্য, শান্ত, উন্নত ও গম্ভীর ছিল। কি হৃদয়, কি দেহ, সকলই তাঁহার মহাপুরুষোচিত ছিল। তাঁহার কথা মনে হইলে হৃদয় আকুল ও লোচন অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। ভক্তবৎসল দয়াময় তাঁহার আত্মাকে আপন শান্তিময় ক্রোড়ে গ্রহণ করুন এবং তাঁহার আত্মানুরূপ একমাত্র বংশধর পুত্র শ্রীমান্ মহীন্দ্ররঞ্জনকে তদীয় পিতৃগুণের অধিকারী করিয়া নিরাময় ও দীর্ঘজীবী করুন। রঙ্গপুরে সেই স্বর্গীয় মহাত্মার একটী স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপিত হইবে শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম।

(গ) আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত মহোদয় অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। ইঁহার পিতৃদেব ৺কালীনারায়ণ গুপ্ত ঋষিকল্প ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ঈশ্বরভক্তি, অমায়িকতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, পরোপকারিতা প্রভৃতি গুণের কথা স্মরণ করিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। তাঁহার পুত্রগণ সকলেই অসাধারণ কৃতী। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র K. G. Gupta, C.S. I. পিতৃ পুণ্যবলে আজি বাঙ্গালীর আশাতীত রাজপদে প্রতিষ্ঠিত। ৺গঙ্গাগোবিন্দ স্বীয় পুণ্যাত্মা পিতার দেবহৃদয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত যিনি একবারমাত্র আলাপ করিয়াছেন, তিনি আজীবন তাঁহাকে ভুলিতে পারিবেন না। বড়ই আক্ষেপের বিষয়, দুর্ব্বহ রাজকার্য্যে গুরুতর পরিশ্রম করিয়াই তিনি অকালে সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া প্রস্থান করিলেন। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহার আত্মার অনন্ত শান্তি বিধান করুন।

২। উদার দৃষ্টান্ত। বিগত ১২ই মার্চ্চ, যতীন্দ্রনাথ সেন নামক একটী যুবক, বরিশালের কুলকাটি নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায় চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। সেই বিবাহার্থী যুবক, বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে, তাঁহারা কন্যা-পক্ষ হইতে যৌতকাদির ব্যপদেশে যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কন্যা-কর্ত্তাকে প্রত্যর্পণ না করিলে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। অগত্যা বরকর্ত্তাকে সে সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিতে হইল। আশা করি, অন্যান্য বিবাহার্থী ভদ্রসন্তানেরাও এই বালকের মহৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবেন। ইহারি-নাম প্রকৃত দেশহিতৈষিতা।

৩। প্রাচীন নরকঙ্কাল। সম্প্রতি ফ্রান্সে একটী নরকঙ্কাল ভূগর্ভ হইতে পাওয়া গিয়াছে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন,—ঐ কঙ্কাল যাহার, সে মানব চারি লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীতে জীবিত ছিল। খৃষ্ট-ভক্তেরা পৃথিবীর সৃষ্টিকাল চারি হাজার বর্ষের অধিক বলিয়া স্বীকার করেন না। প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়।

৩। সম্প্রতি সাহরাণপুর হইতে সংবাদ আসিয়াছে,—তত্রতা প্রশস্ত রাজপথে এক ব্যক্তি টাকা লইয়া যাইতেছিল। পথি-মধ্যে দস্যুদল তাহাকে আক্রমণ করিল। সেই অসহায় পথিক প্রাণভয়ে তাহার সমস্ত টাকা দস্যুদিগকে দিতে যাই-তেছে, এমন সময় এক বাজিকর ভালুক ও বানর লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। ব্যাপার বুঝিয়া সে উচ্চৈঃস্বরে দস্যুদিগকে নিষেধ করিল। দস্যুরা তখন ভালুকওয়ালাকে আক্রমণ করিল। সেও হস্তস্থিত যষ্টিদ্বারা ভালুককে সঙ্কেত করিবামাত্র, ভালুক উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া দস্যুদিগকে আক্রমণ করিল। দস্যুরা তৎক্ষণাৎ দ্রুতবেগে পলায়ন না করিলে, ভল্লুকের হস্তে খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইত।

"অরক্ষিতং তিষ্ঠতি দৈবরক্ষিতং
সুরক্ষিতং দৈবহতং প্রণশ্যতি।"

—রাখেন হরি, মারে কে? মারেন হরি, রাখে কে?

পুস্তক সমালোচনা।

নূতন গ্রন্থ। 'কেশবজ্যোতি' 'মনো-জবা' রচয়িত্রী শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর রসময়ী লেখনীর মধুধারা। ইহাতে নানা-বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতা আছে। প্রতি কবিতাই তাঁহার মধুময় হৃদয়ের প্রতিবিম্ব। এ সকল মহিলা কবির উদয় স্ত্রীশিক্ষার উপাদেয় ফল। এ স্ত্রীশিক্ষার সহিত বামাবোধিনীর ও বামাবোধিনীর প্রবর্ত্তক স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্তের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নিশ্চয়ই সেই স্বর্গীয় মহাত্মা তাঁহার স্নেহলালিতা

লতিকার এই অমৃতময় ফল দর্শন করিয়া পুলকিত হইতেছেন। এ সকল প্রতিভা-শালিনী মহিলা একান্ত যত্নে মহাকাব্য-রচনায় প্রবৃত্তা হইলে, বঙ্গভাষা অধিকতর গৌরবশালিনী হয়। জাতীয় মহাকাব্যই দেশের অনপায়িনী কীর্ত্তি।

বামারচনা।

অপূর্ণ প্রেম।

থানেশ্বর রণশেষে,
ফিরিল সৈনিকগণ ;
কাঁপিল সে হিন্দুস্থান
জয়োল্লাসে ঘন ঘন।

ছুটিল সে প্রতিধ্বনি,
সীমা হ'তে সীমান্তরে ;
কুটীরে বিবশা বালা,
বেপমানা হর্ষভরে।

বিজয়ী প্রাণেশে বরি –
লইতে মোহিনী বালা ;
দাঁড়ায়ে কুটীর-প্রান্তে,
করেতে মঙ্গলডালা।

হেমরশ্মি রবিছটা,
পশ্চিমে পড়িল ঢলে ;
কেহ ত বিজয়মালা,
না নিল আসিয়া গলে।

ধূসর বসন পরি
সাজিলেন সন্ধ্যারাণী ;
তিমিরে ডুবিয়া গেল,
উৎসবের গ্রামখানি।

ভাস্কর-পুত্তলিপ্রায়,
তখনো দাঁড়ায়ে দ্বারে ;
কেহ ত এল না হায়!
সম্ভাষিতে বালিকারে।

নিরাশার তপ্তশ্বাস,
নীরবে বহিয়া গেল ;
ইন্দীবর আঁখি দুটী,
অশ্রুজলে ভরে এল।

কৃষ্ণ যবনিকা তুলি,
নভঃপটে শশধর ;
তারকা কিন্নরী সনে,
হাসিলেন মনোহর।

বহিল দক্ষিণানিল,
পাপিয়ার পিউতানে ;
প্লাবিত সারাটী বিশ্ব,
প্রকৃতির শোভাদানে।

বিশ্বের সে দৃশ্যপট
প্রকৃতির অভিনয় ;
বালিকা করিল তুচ্ছ,
উন্মাদ হৃদি তন্ময়।

জ্যোৎস্না তরঙ্গ মথি,
কে অই যুবক ধীরে ;
দাঁড়াইল বালিকার
পদপ্রান্তে নতশিরে।

দীর্ঘাকৃতি গৌরকান্তি,
উন্নত ললাটদেশ ;
আজানুলম্বিত বাহু,
পিধান সৈনিকবেশ ।

"সমরেন্দ্র ! এতক্ষণে,
কুশল ত সমাচার ?
কোথা সেই অরিন্দম,
কি কার্য্যে বিলম্ব তাঁর ?

চাতকী সে উর্দ্ধমুখে,
চেয়ে থাকে নভঃ পানে ;
সেকি তোষেনাক তারে,
এক বিন্দু জলদানে ?

একটী বরষ আছি,
আশাপথ চেয়ে তাঁর ;
এখনো কুণ্ঠিত তিনি,
দেখা দিতে একবার !

একটি বরষ ধরে,
করিয়াছি তাঁরে ধ্যান ;
দিবানিশি দণ্ড পল,
মোর নাহি ছিল জ্ঞান ।

তৃষিত হৃদয় আছে,
সেই মুখ হেরিবারে ;
তৃষাতুরা চাতকীর
পিপাসা কেবা নিবারে ?"

"দেবি ! দোষিও না তাঁরে"
সরিল না বাক্য আর ;
রুদ্ধকণ্ঠ সমরেন্দ্র—
আঁখিকোণে অশ্রুভার ।

"একি সমরেন্দ্র ! তব
হেরি ভাব বিপর্য্যয় ?
রণক্ষেত্র-সমাচার,
বল ত্বরা সমুদয় ।

চকিতা হরিণী সম,
আছি সদা শশঙ্কিত ;
ক্ষণে ভয়, ক্ষণে আশা,
করে প্রাণ উদ্বেলিত ।

প্রতিধ্বনি মুখে শুনি,
জয়বার্ত্তা ঘন ঘন ;
উন্মাদিনী বাহিরিনু,
হেরিবারে প্রিয়জন ।"

"শুন দেবি ! ক্ষণ তরে,
বজ্রে বাঁধ কম হিয়া ;
কোমলতা বৃত্তিগুলি
মুহূর্ত্তেক পাসরিয়া ।

কাঠিন্য দৃঢ়তা-শক্তি—
শক্তিপদে মাগি লও ;
বাঁধ বুক বজ্রবাণী
শুনিতে প্রস্তুত হও ।

কুরুক্ষেত্র রণক্ষেত্রে
অদ্বিতীয় যুদ্ধবীর ;
শুনিয়াছি পরাক্রম
তেজস্বিতা ফাল্গুনীর ।

দ্বিতীয় পার্থের সম,
তিরোপিয় রণমাঝে ;
হেরিয়াছি অরিন্দমে,
অসীম সংগ্রামসাজে ।

শত্রুব্যূহ ছিন্ন করি,
বিপক্ষে দলিয়া পায় ;
শোয়াইতে কত বীরে,
হেরিয়াছি অসিঘায় ।

কিন্তু ওহো ভবিতব্য,
কেমনে বলিব হায়!
সে বীরত্ব অস্তমিত,
অরাতির গুপ্ত ঘায়।"
নিরখিল সমরেন্দ্র
আঁখি ছুটী অশ্রুময়;
কুসুম-কোমল প্রাণে,
আহা আর কত সয়?
ছিন্ন লতিকার মত,
ভূমিতে লুঠিল বালা;
আর না মেলিল আঁখি,
জুড়াল মরতজ্বালা।

শ্রীমতী সরলাসুন্দরী মিত্র।

বরষার ফুল।

১

ফুটেছে কানন জুড়ে বরষার ফুল,
ভাদরের ভরাজল
করিতেছে কল্ কল্
ভাসিয়া গিয়াছে স্রোতে এ কূল ও কূল।

২

ফুটেছে কানন জুড়ে বরষার ফুল,
তরুলতা হাঁটু-জলে,
কুন্তল দিয়াছে খুলে,
ছলিছে পল্লবাঞ্চল ঢুলু ঢুলু।

৩

ফুটেছে কানন জুড়ে বরষাকুসুম
নাই প্রজাপতি, অলি,
ঘুমেতে পড়েছে ঢলি,
বসন্তের সমাগমে ভাঙ্গিবে এ ঘুম।

৪

ফুটেছে কানন জুড়ে বরষার ফুল,
ডুবু ডুবু বৃষ্টিজলে,
সমীর নাচিছে কোলে,
অমরার ধন এ যে ধরাতলে ভুল।

৫

আহা!
ফুটেছে কানন জুড়ে সুমধুর ফুল,
কচিৎ রবির আলো,
সে মুখে শোভেছে ভালো,
কচিৎ চাঁদিমা আসি হাসিয়া আকুল।

৬

ফুটেছে কানন জুড়ে অশ্রুমুখী-ফুল,
নীর কণা ভূষা তার,
কোমলাঙ্গ চমৎকার,
দেবতার আশীর্বাদ অমৃত মুকুল।

৭

আহা! ফুটেছে কানন জুড়ে বরষার ফুল,
নিজে হাসে, নিজে কাঁদে,
প্রেমডোরে নাহি বাঁধে
কোন প্রিয়জন—এ যে দেববালা-তুল।

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

স্নেহ-প্রতিমা।

জীবনের এক যুগ গেছে মা! বহিয়া
সেই হাসি, ধূলাখেলা
ফুরাল কি এই বেলা,
গেছে কি জীবন-তারা আঁধারে ডুবিয়া?

সেই যে সেদিন তোর শুভ পরিণয়
হাসি-ভরা মুখখানি
আমার সোণার রাণী !
এসব কি মিছে খেলা ? সম্ভব কি হয় ?
এমন চাঁদনি রাতি শান্ত নিশিথিনী—
পড়িয়া রক্তিম শাড়ী
সীমন্তে সিন্দুর পরি
দাঁড়ালে পতির পাশে লক্ষ্মীস্বরূপিণী।
বয়েছিল পরিমল—মধুর এমনি !
আনন্দ-উচ্ছ্বাস-ভরে
"দিগেন কুমার"—করে
সঁপিলেন সযতনে জনক জননী।
সে সব কি মিছে খেলা মিছে অভিনয় ?
গভীর তরঙ্গ মাঝে,
কি আবর্ত্তে ভেসে গেছে,
পড়ে আছে একখানি ছবি স্বপ্নময় !
সাধের সে মালাগাছি গিয়াছে শুকায়ে,
আজি কেন হেন বেশে
নীরবে দাঁড়ালে এসে ?
গিয়াছে কি "ধ্রুব তারা" আঁধারে ডুবিয়ে ?
একি অবিচার তব ওগো নারায়ণ !
সোণার কুসুমকলি
নিঠুর চরণে দলি
সাজালে যোগিনীবেশে, উহু কি ভীষণ !
চতুর্দ্দশ বর্ষ আজও হয়নি পূরণ,
পুতুলের খেলা সম
হায় একি নিরমম !
মুহূর্ত্তে ভাঙ্গিয়া দিলে সাধের স্বপন !
আয় মা সরযূ। আয় জুড়াতে যাতনা,
আজি শত বুক চিরে
লুকায়ে রাখিব তোরে
পৃথিবীর—বিষবায়ু লাগিতে দিব না।
এস মা সরযূ ! এস সান্ত্বনা লভিতে,
শিখিবে ধরমকথা
ভারত পুরাণগাথা
পড়িবে মা ! এবে তুমি একান্তমনেতে।
বিধির উদ্দেশ্য কাজ করিতে সাধন
পরদুঃখ-বিমোচনে
খাটিবে প্রশান্তমনে.
শোক দুঃখ বিশ্বকাজে দিবে বলিদান।
অনিত্য সংসার এই জেনো মা আমার !
অলক্ষ্য নেপথ্যমাঝে,
আত্মার মিলন আছে,
ইহাই শোকের শান্তি. জানিবে মা সার।
শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়।

খোকা।

ঘুমন্ত এক স্বপ্নরাজ্যের
সোণারসরোবরে,
ফুটেছিল সোণার কমল
থরে থরে।
কমলদলে কমল ছেলে
কমল হাসিমুখে,
স্বপ্নরাজ্যের—অলস হাওয়ায়
ঘুমিয়েছিল সুখে।

পবন তারে বাতাস দি'ত
ফুলের পরাগ দিয়ে,
চাঁদ, সূর্য্য কিরণ দিত
কোমল তনু ছেয়ে।

সুরভি তার দুধ যোগাত
সাগর নদী বয়ে,
ঘুম পাড়াতেন নিদ্রাদেবী
সোহাগ গীতি গেয়ে।

কমলদলে কমল ছেলে
খেলতো কত খেলা,
কে তাহারে জাগিয়ে দিলে
ঠিক্ দু'পুরের বেলা ?

উষার কোলে অরুণ যেন
রাঙা হাসি মাখা,
স্বপ্নরাজ্যের সোণার ছবি
সোণার পটে আঁকা।

অজানা কোন স্বর্গ থেকে
ইন্দ্রপুরীর শোভা—
আঁধার কুটীর আলো করে,
ছড়িয়েছিলি আভা॥

ভাঙ্গা ঘরে চাঁদের আলো
চন্দ্রলোকের ছবি ?
প্রভাতের কি বাঁশরী-তান
বসন্তের কবি !

অথবা কি পারিজাতের
সুরভি নিশ্বাস !
নন্দের কি মৃদুমধুর
মলয়া-বাতাস ?

চাঁদের কিরে জ্যোৎস্নাটুকু
নদীর কি তুই ঢেউ,
স্বর্গরাজ্যের পবিত্রতার
তুই কি খোকা কেউ !

আঁধার ঘরের আলো কি তুই
ভাঙ্গা ঘরের বেড়া ?
রোদ বাদলার দুর্গতি কি তুই
সুখ দুঃখ-হরা ?

নিরাশার কি আশা রে তুই
আনন্দের কি হাসি ?
জ্যোৎস্নাভরা চন্দ্রলোকে
তুই কি সুধারাশি !

পিপাসীর কি মন্দাকিনী ;
মোহে কি মদিরা !
খোকারে তুই কোন স্বরগের,
পবিত্রতায় গড়া !

বিষ্ণুপূজার অর্ঘ্য কি তুই !
শিবরাত্রের বাতি !
কে তুমি ধন ! দিবানিশি
খুঁজি পাতি পাতি।

এ জগতের নও ত তুমি
স্বর্গরাজ্যের আলো,
আমাদের এ আঁধার ঘরে
সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বাল।

শ্রীমতী শেফালিকা দেবী।

২৯।৩ মদন মিত্রের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৯ নং আণ্টনিবাগান লেন হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 553. September, 1909.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৪৭ বর্ষ। ৫৫৩ সংখ্যা। { ভাদ্র, ১৩১৬। সেপ্টেম্বর, ১৯০৯। } ৯ম কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বামাবোধিনীর নব বর্ষ—হে করুণাময়ি বিশ্বজননি! তোমারই বিশেষ কৃপায় দীনা বামাবোধিনী ৪৬ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৪৭ বর্ষে পদার্পণ করিল। উহার জীবনে আজ তোমার মঙ্গল হস্ত সুস্পষ্টরূপে দেখিয়া তোমাকে প্রাণের গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদান করিতেছি, দয়া করিয়া গ্রহণ কর। আজ দুই বৎসর পূর্ণ হইল, বামাবোধিনী পিতৃহীনাবস্থায় কিরূপ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্য দিয়া অতি দীনভাবে তোমারই আদিষ্ট পথে প্রাণপণে অগ্রসর হইতেছে, তাহা সকলই তুমি জানিতেছ। আজ তোমার চরণে কাতর-ভিক্ষা এই, তুমি ইহাকে ইহার এই ঘোর অসহায় অবস্থায় দীর্ঘজীবিনী করিয়া ইহার মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করাও। বামাবোধিনী আজ তাহার সহৃদয় গ্রাহক গ্রাহিকা ও হিতৈষী বন্ধুগণকে বিনীত প্রণাম করিয়া সকলের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছে, সকলে তাহার জীবন পথের সহায় হউন।

চিনির কারখানা—যুক্তপ্রদেশস্থ নাইনি সহরে একটী নূতন চিনির কারখানা খোলা হইতেছে। কারখানার গৃহাদি প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছে। তত্রত্য ছোট লাট বাহাদুর এই কারখানাবাড়ীর ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং উৎসাহসূচক এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছেন। দেশের এরূপ হিতকর কার্য্যে রাজপ্রতিনিধির উৎসাহদান প্রার্থনীয়।

কারখানা আইন—সম্প্রতি ভারত-গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় এক নূতন আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করা হইয়াছে। এদেশের কারখানা সম্বন্ধেই এই নূতন আইন খাটিবে। কোন্ শ্রেণীর মজুরগণ কারখানায় দিন রাত্রিতে কত